

রক্তাক্ত মানচিত্র



Extra Facilities

SHAHIDUL MAZID MUNNA
72/B Malibagh Chowdhurypara
Dhaka-1219, Phone ; 414706



রক্তাত্ত মানচিত্র

আবদুল হাফিজ
সম্পাদিত

মুদ্রাশা



মুজিবনগরে প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৭১

ঢাকায় পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ১৯৭৪

প্রকাশ করেছেন :

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা

মুক্তধারা

[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]

৭৪ ফরাশগঞ্জ

ঢাকা-১

বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :

আশীষ চৌধুরী

ছেপেছেন :

শ্রীপ্রভাশুরঞ্জন সাহা

ঢাকা প্রেস

৭৪ ফরাশগঞ্জ

ঢাকা-১

মূল্য নয় টাকা

RAKTAKTA MANCHITRA

(Collection of Poems)

Edited By Abdul Hafiz

MUKTADHARA

[Swadhin Bangla Shahitya Parishad]

74 Farashgonj, Dacca-1

Bangladesh

Price Taka 9'00

সূচীপত্র

বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও বাংলাদেশের কবিতা

৯

১

একুশে ফেব্রুয়ারী

জসিম উদ্দীন	॥ একুশের গান	৪৭
সুফিয়া কামাল	॥ শহীদ মিনার	৪৮
আলাউদ্দীন আল আজাদ	॥ একুশে ফেব্রুয়ারী	৪৯
আবদুল গণি হাজারী	॥ একুশে ফেব্রুয়ারী	৫১
দিলওয়ার	॥ একুশের কবিতা	৫২
ফজল শাহাবুদ্দিন	॥ উনিশশো বায়ান্নোর একটি দিন	৫৪
মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	॥ একুশের গাথা	৫৬
কাইয়ুম চৌধুরী	॥ একুশে স্মরণে (১৯৭০)	৫৭
আসাদ চৌধুরী	॥ আমি একটি কাপুরুষ	৫৮
নিয়ামত হোসেন	॥ আশ্চর্য জননী	৬০
বাঙলাভাষা		
শামসুর রহমান	॥ বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা	৬৩
ফজল শাহাবুদ্দিন	॥ বাঙলাভাষা, মা আমার	৬৫
মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	॥ বাংলা ভাষার প্রতি	৬৯
	॥ মাতৃভাষা	৭০

৩

বাঙলাদেশ

সৈয়দ আলী আহসান	॥ আমার পূর্ববাংলা	৭৩
সানাউল হক	॥ পূর্ববাংলা—এক	৭৭
	॥ পূর্ববাংলা—দুই	৭৮

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী	॥ আমার দুঃখিনী বাংলা	৭৯
কায়সুল হক	॥ আমার বাংলা	৮১
আল্‌ মাহমুদ	॥ নিদ্রিতা মায়ের নাম	৮২
আবুবকর সিদ্দিক	॥ স্বদেশের নাম (সন্দীপন গোপীর জন্মে)	৮৩
হায়াৎ মামুদ	॥ স্বদেশের ছবি	৮৪
মনজুরে মওলা	॥ মাতৃভূমি তোমার দীন রক্তকে	৮৬
ফজল শাহাবুদ্দিন	॥ নবান্ন : ১৩৭৬	৮৭
	॥ আমার বাংলা	৮৮
	॥ বাংলা আমার স্বপ্ন আমার	৮৯
আহমদ রফিক	॥ এ দেশ আমার স্বর্গ	৯১
হুমায়ুন কবির	॥ বাংলার কারবালা	৯২

৪

উনসত্তুরের বাঙলাদেশ

শামসুর রহমান	॥ ফেব্রুয়ারী : ১৯৬৯	৯৫
	॥ আসাদের শার্ট	৯৯
এনামুল হক	॥ বিদেশ থেকে চিঠি (সাপ্তাহিক 'জনতা' সমীপেষু)	১০০
মুস্তাফিজুর রহমান	॥ হে বন্ধু তোমাকেই	১০১

৫

এপার বাঙলা ওপার বাঙলা

সিকান্দার আবু জাফর	॥ রবীন্দ্রনাথ	১০৬
আতাউর রহমান	॥ রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ ক'রে	১১০
শামসুর রহমান	॥ ঋণী	১১২
আল্‌ মাহমুদ	॥ রবীন্দ্রনাথ	১১৩
আবুবকর সিদ্দিক	॥ রবীন্দ্রনাথের নামে	১১৪
নিয়ামৎ হোসেন	॥ রবীন্দ্রনাথের প্রতি	১১৬
হুমায়ুন কবির	॥ রবীন্দ্রসঙ্গীতে ঝট	১১৮

শামসুর রাহমান	॥ কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি	১১৯
হায়াৎ মাহুদ	॥ বর্ষার বাংলার কবিকে	১২১
	[উৎসর্গ : কাজী নজরুল ইসলাম]	
শামসুর রাহমান	॥ কবিরাজ রমেশ শীল	১২২
	॥ গ্রন্থে আছেন শহীদুল্লাহ	১২৪
দিলওয়ার	॥ মহাত্মাজীর প্রতি ভগৎ সিং	১২৬
আবুল হোসেন	॥ বাংলার বাঘ	১২৭
ফজল শাহা বুদ্ধিন	॥ শেরে বাংলার স্মৃতি	১২৮

৬

স্বপ্না, ক্রোধ, হরতাল, মিছিল, মৃত্যু ও সংগ্রাম

সিকানদার আবু জাফর	॥ অবাক দেশের জাতীয় সঙ্গীত	১৩১
শহীদ সাবের	॥ শোকার্ত মায়ের প্রতি	১৩৭
আলাউদ্দীন আল আজাদ	॥ ইকড়ি-মিকড়ি	১৪০
মহহারুল ইসলাম	॥ আজকের কবিতা	১৪৫
শামসুর রাহমান	॥ প্রকারভেদ	১৪৬
	॥ এ লাশ আমরা রাখবো কোথায় ?	১৪৭
	॥ রাজ কাহিনী	১৪৮
	॥ ছেলেটা পাগল নাকি ?	১৪৯
	॥ পুলিশ রিপোর্ট	১৫১
	॥ হরতাল	১৫৩
	(শহীদ কাদরীকে)	
সৈয়দ শামসুল হক	॥ কবিতা ৫৭৭	১৫৬
	(একটি অংশ)	
আল্ মাহমুদ	॥ কারফিউ	১৫৭
	॥ অসহ সময় কাটে	১৫৮
আবুল হোসেন	॥ গোরি সেন	১৫৯
	॥ দেবো, সব দেবো	১৬০
	॥ বাজার দর	১৬২

আবুবকর সিদ্দিক	॥ হৈমন্তী রতকথা	১৬৩
	॥ শপথের স্বর	১৬৬
আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ	॥ একান্ত দেবরাজের পাণ্ডুলিপি	১৬৮
দিলওয়ার	॥ স্বাধীনতা অলছে	১৬৯
নির্মলেন্দু গুণ	॥ লজ্জা	১৭০
আবদুর রশিদ খান	॥ শতাব্দী সাক্ষী	১৭২
আসাদ চৌধুরী	॥ বারবারা বিড়লার কে	১৭৩
ওমর আলী	॥ সাহস	১৭৬
মাসুদ আহমেদ মাসুদ	॥ অবাক হবো না	১৭৭
আনসার আলী	॥ রক্ত দিলাম মাগো	১৭৮
আহমেদ মনসুর	॥ এক দৃশ্য আজকাল	১৮৯
মাকিদ হায়দার	॥ স্তব্ধগ্ৰামে যাবো	১৮১
এম. আনিজ্জামান	॥ রক্তের আখরে লেখা হলো ইতিহাস	১৮৪

বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম

ও

বাংলাদেশের কবিতা

১

মুক্তিসংগ্রামের পটভূমি

গত মহাযুদ্ধের পর থেকে দেশে দেশে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের তিনটি বিশিষ্ট পর্যায় দেখা যায়,—(১) ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের মিলিত প্রতিরোধ ও সংগ্রাম এবং বহুসংখ্যক দেশের স্বাধীনতা-লাভ ; (২) ইতিপূর্বে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলিতে জনগণের নতুন সংগ্রাম—এ-সংগ্রামের মূল কথা জাতীয় স্বাধীনতা, শান্তি, প্রগতি ও নিরাপত্তার জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নবতর জেহাদ এবং এ-ধরনের নব ক্ষেত্রেই নব স্বাধীনতা-লব্ধ দেশগুলির সরকারমূহ নিজ নিজ জনগণের বিরুদ্ধেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কখনো গোপন ও কখনো প্রকাশ্যভাবে আতাত তৈরী করে জনগণকে শোষণ করে এবং (৩) সংখ্যাগুরু স্বতর্ঘ্যধারীর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে সাম্রাজ্যবাদের নয়া ষড়নীতির আড়ালে আগ্রহ গ্রহণ, যেমনটি করা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় ও বোডোয়। পাকিস্তান দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলির অন্তর্ভুক্ত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় ধর্মিক-বর্ণিক-ভূস্বামী এবং অভিজাত বুর্জোয়া মুসলিমদের সংগঠন মুসলিম লীগকে গর্তস্থ সম্ভানের মত লালন করে এবং এই প্রতিষ্ঠানটির দাবি অনুযায়ী ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে আর পত্তন করে পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রের। মুসলিম লীগের শ্রেণীচরিত্র ছিল সামন্তবাদী—নবাবজাদা, পীরজাদা, সাহেবজাদা, সৈয়দা খাঁসাহেব, প্রভৃতি ভূস্বামী-গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত এই প্রতিষ্ঠানটি সচ্ছন্দ কার্যেই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে হিংস্র হায়েনার মত জনগণের রক্ত পান করতে থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রকৃত শাসন-ক্ষমতায় থাকল না বটে, কিন্তু যেহেতু তখন পাকিস্তানে ব্রিটিশ পুঁজির পরিমাণ ছিল এক হাজার কোটি টাকা, সেহেতু নিজ গরজেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানের সামন্তবাদী সরকারের সঙ্গে হাত মেলায় ; তদুপরি গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত মার্কিন অর্থনৈতিক

রক্তাক্ত মানচিত্র—১

সাম্রাজ্যবাদ লুপ্ত দৃষ্টি নিয়ে পাকিস্তানের অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশের পথ খঁজিতে থাকে। পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক সামন্তবাদী প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলি দুর্বল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন মার্কিন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের টোপ সহজেই গিলে ফেলে।

মার্কিন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানকে ১৯৫১ সালে 'সাহায্য' হিসেবে দেয় ৫ মিলিয়ন ডলার, ১৯৫২ সালে দেয় ১০ মিলিয়ন ডলার এবং ১৯৫৩ সালে এই সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৪.২ মিলিয়ন ডলার। বলা বাহুল্য, এই 'সাহায্য'র একটি পরিসাও পাকিস্তান নিজের খুশিমতো খরচ করতে পারতো না। যে-পারস্পরিক নিরাপত্তা প্রোগ্রামের (Mutual Security Programme) অধীনে এই অর্থ প্রদান করা হয়, তার ফলে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে পাকিস্তান ব্যবসা-বাণিজ্য করবার অধিকার হারায়। অসংখ্য মার্কিন বিশেষজ্ঞ দল পাকিস্তানের প্রশাসন বস্ত্রটির অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ার ফলে কোনও কিছু গোপন রাখবার উপায় ছিল না। 'সাহায্য রাজনীতি'র (Aid Politics) অন্ততম লক্ষ্য ছিল সামরিক বড়োয়। ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান-মন্ত্রী মোহাম্মদ আল (বগুড়া) ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান মার্কিন মুম্বাইয়ে নিমন্ত্রিত হন। এর ঠিক একমাস পরে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ বেসরকারীভাবে তীর্থ-ভূমি ওয়াশিংটন সফর করেন। ঐ একই বছরের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিমন্ত্রন করাচীতে এসে যুরে যান। এসব শুভেচ্ছা সফর ও পান্টা সফর মূলত পাকিস্তানকে সামরিক জোড়ের মধ্যে নিষ্কেপ করে। ১৯৫৪ সালেই পাকিস্তানের সঙ্গে তুর্কির একটি বন্ধুত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষরে সহায়তা করে মার্কিন প্রশাসন। এই একই বছরে পাকিস্তান মার্কিন সাহায্য পায়, এই একই বছরে একদল মার্কিন সমা-বিশেষজ্ঞ মেজর জেনারেল স্ট্রাংটনের নেতৃত্বে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে 'উপদেশ' দিতে আসেন—এই একই বছরে অ্যাডমিরাল বেড-ফোর্ড ও জেনারেল ভ্যান ফ্লিট পাকিস্তান সামরিক বাহিনীগুলি 'পরিদর্শন' করেন। ১৯৫৫ সালের মধ্যেই ২৫০ জন মার্কিন সমর-বিশেষজ্ঞ পাকিস্তানে স্থায়ী 'উপদেষ্টা' হিসেবে কাজ করতে থাকেন। এসব উপদেষ্টার প্রধান

কাজ ছিল চীন-সোভিয়েতের সীমান্তে গোয়েন্দাচক্ষু (Detective Eye) স্থাপন করে চীন-সোভিয়েতের গুরুত্বপূর্ণ স্থান সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়া। চিচল, গিলগিট, পেশোয়ার এবং রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি অঞ্চলে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্র স্থাপন করেন। এদের সঙ্গে সঙ্গেই বার্লিন থেকে এসে পৌঁছায় দক্ষ সি. আই. এ. গোয়েন্দাচক্ষু। এসবও নশ্টি, ১৯৫৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্বাক্ষরিত হল 'সিরাটো চুক্তি' (South-East Asian treaty Organization) এবং ১৯৫৫ সালের ২৩ এ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত হল বাগদাদ চুক্তি [১৯৫৯ সাল থেকে এ চুক্তি সেন্টো (SENTO) নামে পরিচিত হয়] আর এভাবেই পাকিস্তানের প্রতি-ক্রিয়াশীল সরকারগুলি পাকিস্তানকে অধৈমভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি 'স্টেটে, পরিণত করতে সহায়তা যোগায়।

কাজেই সাম্রাজ্যবাদী খপ্পরে পড়ে পাকিস্তানের জাতীয় স্বাধীনতা শাস্তি, নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে এবং স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে গিয়ে পাকিস্তানের অধিকার-বঞ্চিত জনগণ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রাম শুরু করেন, তেমনি সে সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চরিত্র অর্জন করে। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম পাকিস্তানের বৃহত্তর জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের একটি মহান অংশ। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সফলতা পাকিস্তানের জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ত্বরান্বিত করবে। পশ্চিম পশ্চিম পাকিস্তানের জাতিসত্তাগুলি (Nationalities) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী পাকিস্তানের সামরিক সরকারের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে নিজ নিজ সংস্কৃতি অনুযায়ী নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে।

গত ২৪ বছর ধরে পাকিস্তানের জনগণ-বিরোধী সরকারগুলি বাংলা-দেশের বেলায় একটি ক্যাসিট নীতি অনুসরণ করেছে। এবং এই এক স্তলে করাচী-পিণ্ডির সরকারগুলি দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রোডেশিয়ার খেতকার সংখ্যালঘু সরকারগুলির মতই জাতিসত্তাবিরোধী কর্ম তৎপরতার লিপ্ত হয়। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে গ্রায্য অধিকার থেকে শুধু বঞ্চিতই করা হল না, যাতে বাংলাদেশের জনগণ ক্ষমতায় না যেতে পারে, তার সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশীরা যে 'অসভ্য'—একথা প্রমাণ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। বাংলা সাহিত্যকে

তথাকথিত হিন্দু ভাবধারা থেকে মুক্ত করবার জন্য নতুন নতুন সংস্থা গঠিত হতে থাকে। আরবী, ফারসী, উর্দু শব্দ আমদানি করে বাঙলাভাষার 'ইসলামীকরণ', বাঙলাভাষার বর্ণমালাকে উর্দু, ফারসী, আরবী কিংবা রোমান হরফে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা, বাঙলা বানান সংস্কারের উদ্ভট পরিকল্পনা প্রভৃতি ছিল করাচী পিণ্ডির সরকারগুলির ষড়যন্ত্রের বিশিষ্ট অঙ্গ।

সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-শূন্যে ঔপনিবেশিক আইন-কানুন যেমন পেয়েছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তেমন পেয়েছিল একটি জাতিসত্তা বিধেয়ী সাংস্কৃতিক তত্ত্ব। ইসলাম ও জাতীয় সংহতির নামে বাঙলাদেশকে শোষণের পথই শুধু উন্মুক্ত করা হল না, সেই সঙ্গে পাকিস্তানের জাতিসত্তা ও উপজাতিগুলির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নিশ্চিতভাবে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হল। পাখতুন, বেলুচ ও সিন্ধীদের ঐতিহ্য-বাহী সাহিত্য সংস্কৃতির ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানা হতে থাকে। বাঙালী শিল্পী-সাহিত্যিকদের মতই সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও পাখতুনিস্তানের অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক কারাবরণ করেন। এই তিনটি অঞ্চলের জনগণ বাঙালী জনগণের মতই অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো সুফল ভোগ করেন নি। কিন্তু এতেও যখন সাধ মিটল ন', তখন মাকিন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিরা 'এক ইউনিট' ব্যবস্থা প্রবর্তন করে পশ্চিম পাকিস্তানের সবক'টি জাতিসত্তার বিলোপসাধনে প্রবৃত্ত হয়। অন্তর্দিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জনগণের ক্ষেত্রে 'এক মাথা এক ভোট' নীতি অস্বীকার করে জাতীয় পরিষদে উভয় প্রদেশের সদস্যসংখ্যা সমান সমান হবে বলে ঘোষণা করা হল। এভাবেই ইঙ্গ-মাকিন সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের স্বার্থে পাকিস্তানের জাতিসত্তাগুলি সমস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে পদদলিত করা হল। অথচ 'স্বাধীন ছনিয়ার' হত্যাকর্তা মাকিন সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত সংবাদ জান সত্ত্বেও একটি নিরীহ বাক্য পর্যন্ত উচ্চারণ করে নি। সঙ্গত কারণেই খুনী, মানবতাবিরোধী ইয়াহিয়া-চক্রেস সঙ্গে হাত মেলাতে বিধা করে নি নিম্ন-প্রশাসন। নিম্ননের সঙ্গে পাকিস্তানী পুঁজিপতি ও সামরিকতন্ত্রের বন্ধুত্ব বহু পরনো।

সংগ্রামের সড়ক

পাকিস্তানের জন্ম, বিকাশ ও পরিণতির ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় করাচী-পিণ্ডির সরকারগুলি বাংলাদেশে ইসলাম ও জাতীয় সংহতির পক্ষে কাজ করবার জন্য বুদ্ধিজীবী-দালাল খুঁজে বের করবার আশ্রয় চেষ্টা করেছে। প্রথম দিকে অনেকেই, খুব সম্ভব, নতুন স্বাধীন পাকিস্তানের স্বার্থে ইসলামকে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু ধীরে ধীরে একথা পরিস্কার হয়ে ওঠে যে, পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী 'ইসলাম ধর্ম'কে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। পাকিস্তান খেতাব, সাহিত্য-পুরস্কার ও প্রেসিডেন্টের বিশেষ পুরস্কার প্রভৃতির পত্তন করে আরও নতুন দালাল সংগ্রহ করবার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। অর্থ ও সম্মানের লোভ তো ছিলই। অনেকে জীবন ও জীবিকার তাগিদে সরকারী প্রচেষ্টাগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর নির্বাচিত বুদ্ধিজীবী-দালালের সংখ্যা কম ছিল না। আর কিছু বুদ্ধিজীবী সব কুল বজার রেখে স্বকৌশলে সমস্যার সমাধান করেছিলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক সং বুদ্ধিজীবী কোন ক্ষেত্রেই কোনও পথ করতে না পেয়ে এক দারুণ দোদুল্যমানতায় ভুগেছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের ভাবেদার পাকিস্তানের নর-উপনিবেশবাদী সরকারগুলির জানা ছিল না যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জন্ম নিচ্ছে নতুন বিপ্লবী শক্তি। এই বিপ্লবী শক্তিসমূহ শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামেই নামেনি, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার অর্জনের জন্য বাঙালী যুব-জনতা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে যে, মাতৃভাষাকে যথার্থ মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বাঙালীরা দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করে যাবে।

একুশে ফেব্রুয়ারী

উপরি-উক্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে কবিতার বিকাশ ও পরিণতির কথা আলোচ্য। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয় ১৯৪৮ সালে এবং তা পরিণতি পায় ১৯৫২ সালে। এই আন্দোলনের মধ্যেই অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। ১৯৭২ সালের পরবর্তী বছরগুলি ছিল অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার উৎসারণের কাল। ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলি ক্রমাগত অসাম্প্রদায়িক হতে থাকে। ‘মুসলিম ছাত্রলীগ’ এবং ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’ ‘মুসলিম’ শব্দটিকে বাদ দেয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। পৃথক নির্বাচনের পরিবর্তে যুক্ত নির্বাচনের দাবী উত্থাপিত হয়। ফলে যে-সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সাম্প্রদায়িকতাই পরাস্ত হতে থাকে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ে মূলত সাম্প্রদায়িক শক্তির কবর রচিত হয়। শাসক-শ্রেণী সমস্ত অপকৌশল অবলম্বন করেও ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিক চেতনাকে আর অবরুদ্ধ করতে পারে নি। বাংলাদেশের কবিতাই তার প্রমাণ। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি প্রতিটি একুশে ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য কবিতা। সে-সব কবিতায় ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে, তেমনি বাঙালী জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবনা-চিন্তার প্রকাশও ঘটেছে। সেজগুই ভাষা-আন্দোলন শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল না, বাঙালী জনগণ ভাষা-আন্দোলনকে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে পরিণত করেন। সঙ্গত কারণেই ভাষা-আন্দোলনকে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র ভয়ের চোখে দেখতে থাকে; কেননা এ-আন্দোলনের বিষয়বস্তুতে ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্তবাদ বিরোধী চেতনা। এই আন্দোলনের ফলেই বাংলাদেশের শিল্পী মানস গ্রাম্যতা থেকে মুক্তি পায় এবং নাগরিকতা অর্জন করে। প্রবীণ কবি থেকে তরুণতর কবিরা বীরে হলেও নাগরিকতা অর্জন করেন : সংগ্রামের ভাষায় যুক্ত হয় উজ্জ্বল শানিত নাগরিক চেতনা।

রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে দেখা দেয় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বিক্রপের স্বর, প্রতিজ্ঞা ও
শপথের কণ্ঠস্বরে আসে আধুনিকতার আলোক-উজ্জ্বল ছোতনা। 'একুশের
গানে' জসিমউদ্দীন বলেছেন,

উহার। মানে নি রাজভর আর

পাষণকার।

যত্ন ওদের বক্ষে দানিছে

জীবনধারা

পরিয়া অঙ্গে বুলেট হার

দুরারে দাঁড়ালে স্বদেশমার

বলে মাগো মুছ অঙ্গ হইতে

আঁধারকাল।^১

[একুশের গান]

'শহীদ মিনার' সম্বন্ধে বেগম সুফিয়া কামাল বলেছিলেন ;

মূকের ফুটেছে ভাষা, ভীকু কণ্ঠে বেজে ওঠে গান

শহীদ মিনারে পেল মানুষ পথের সন্ধান।^২

[শহীদ মিনার]

বাংলাদেশের ছেন স্থান ছিল না যেখানে ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের
স্মৃতির উদ্দেশে শহীদ মিনার নির্মিত হয় নি। ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক
দলগুলির নেতৃবৃন্দ শহীদ মিনারে শপথ নিয়েই আন্দোলনে অগ্রসর হতেন।
ঢাকার শহীদ মিনার ছিল বাঙালী জাতির পুণ্যময় মহাতীর্থ। প্রতি-
ক্রিয়াশীল শক্তি শহীদ মিনারগুলি ভেঙে দেবার জন্য মোল্লা-মৌলবীদের
উস্কানি দেয়। কেননা শহীদ মিনার নাকি মূর্তিপূজারই নামান্তর! মিনার
ভেঙে দেবার ঘটনাকে উপলক্ষ করে আলাউদ্দিন আল-আজাদ লিখে-
ছিলেন,

স্মৃতির মিনার ভেঙে তোমার ? ভর কি বন্ধু আমরা এখনো

চারকোটি পরিবার

খাড়া রয়েছি তো। যে-ভিত কখনো কোনো রাজত্ব

পারে নি ভাঙতে

১ সংস্কৃতি সংসদ, (প্রকাশিত ও সম্পাদিত), একুশে স্মরণে, ঢাকা, ১৯৬৯ পৃঃ ৪

২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫

হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার

খুরের ঝটকা ধূলায় চূর্ণ যে-পদপ্রান্তে

• যারা বুনি ধান

গুন টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই

সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্ত ।

ইটের মিনার

ভেঙেছে ভাঙুক । ভর কি বহু, দেখ একবার আমরা জাগরী

চান্নকোট পরিবার ।

[একুশে ফেব্রুয়ারী]

অপেক্ষাকৃত তরুণতর কবিরা বিদ্রুক বস্ঠে কথা বলেছেন । দিলওয়ারের ভাষা,

মুখ বলে : এই দেশে একদা প্রলুক কিছু লোক

নারকী ক্ষমতা নিয়ে ভাগ্যের জুয়ার মেতেছিলো,

এবং যখন তারা চরম ভুজার মারালোকে

সহসা আপন মা ফে জুয়ার পেরেকে গাঁথেছিলো ।

[একুশের কবিতা]

করাচী-পিণ্ডির নিযুক্ত বাঙালী দালালদের উদ্দেশে এর চেয়ে বড় বিদ্রোহ আর কি হতে পারে ।

একুশের উদ্দেশে ফজল শাহাবুদ্দিনের বক্তব্য :

আমি জানি না কী মে যন্ত্রণা

জানি না কেমন সে অনুভূতি

বায়

গোপন বিদীর্ণ উজ্জল উদ্গাদ আকাংক্ষা থেকে

জন্ম নেবে

আমার সম্পন্ন জ্যোতির্মান ভূমণ্ডল

বিশ্বস্ত আত্মার সৌরভের উল্লিখিত আলোছায়া থেকে

মুক্তির মতো স্বাধীনতার মতো প্রতিশোধের মতো

এই একটি দিন ।*

[উনিশ শ' বার্ষিকের একটি দিন]

৩ ফজল শাহাবুদ্দিন, আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন, ঢাকা, ১৩৭৬, পৃঃ ৬৪

১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আরো অনেক আন্দোলন হয়েছে বাংলাদেশে । কিন্তু এক শ্রেণীর লোক কিছুতেই ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করে নি । বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নামে কুস্তীরাশ্রম বর্ষণ করলেও, এদের ছেলেমেয়েরা যেত কিংডারগার্টেনে বা ইংরেজির মাধ্যমে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে । এছাড়া ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার জন্য দেশে যখন আন্দোলন চলছিল, তখনও এরাই বিশ্বাসবাতকের ভূমিকায় নামে । শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির পরিবর্তে যখন বাংলাকে প্রতিষ্ঠার কথা ওঠে, তখন এরাই নানা অজুহাত তুলে তা পিছিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করে । ভাষা আন্দোলনের অগ্রতম ফল ছিল বাঙালা একাডেমি । সেই বাংলা একাডেমির বাংলা পরিচালকেরা একাডেমিকে স্বার্থ গণতান্ত্রিক পন্থায় পরিচালনা করেন নি । কিছুসংখ্যক প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী নিজেদের পদমর্যাদার স্বযোগে এক ডেমিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকেন । রাজনৈতিক দলগুলিও একুশে ফেব্রুয়ারিকে স্ব স্ব স্বার্থে ব্যবহার করতে দ্বিধা করে নি । তরুণ কবি আসাদ চৌধুরী ক্রোধে ফেটে পড়েছেন তাঁর ভাষায়,

আমি আমার রক্তময় শরীর নিয়ে মৃত,
সজীব জিত নিয়ে বোবা ।
লোভ লালসাময় প্রাণ নিয়ে ভোগের আশায়
আত্মাকে উলঙ্গ করি, বিলায়ে দিই,
আমার রক্তে বাস করে অকৃতজ্ঞ শয়তান,
আমি ওদের ত্যাগকে নিয়ে
রাজনীতি করি ।

[আমি একটি কাপুরুষ]

কিন্তু এসব-সব্বেও, সমগ্র বাংলাদেশ একুশের শহীদ সন্তানদের অগ্র মহাগবিত । তরুণ কবি নিম্নামত বলেন,

টকটকে লাল রক্ত মাথা দেখি সন্তানের তোমার শাড়িতে ।
আহত বাছাকে বুকে ধরেছিলে ? মা গো, মুখে বিষয়তা কই ?
চোখে বেদনার জল ? তুমি তো গর্বেই হাসছো, সন্তানেরা
বারবার বুকেটের বিনিময়ে প্রাণ দেয় কচি কচি প্রাণ !
মা গো দুঃখ নেই, কান্না নেই, বিন্দুমাত্র বেদনাও নেই
বরকতের সালামের গর্বে তুমি ভীষণ গবিতা ।^৪

[আশ্চর্য জননী]

৪ সংস্কৃতি সংসদ, (প্রকাশিত ও সম্পাদিত), একুশে স্মরণে, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ২০

একুশের চেতনা থেকেই জন্ম হয় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসার। বাংলাভাষা সম্পর্কে শুরু হয় গবেষণা। বানান ও উচ্চারণ নিয়ে চলে উত্তেজিত তর্কবিতর্ক ও আলোচনা। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুল হাই একত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। লৌকিক ভাষা-সম্বন্ধেও ঔৎসুক্য বেড়ে যায়। কিন্তু এই সার্বিক চেতনা যখন দীপ্ত হয়ে ওঠে, তখন বাংলা বর্ণমালা নিয়ে নতুন ষড়যন্ত্র-জাল রচিত হয়। বানান-সংস্কারের নামে বাংলাভাষার বিরুদ্ধে আরও একবার স্রষ্টা হয় নতুন বিতর্ক এবং শাসক-চক্র সর্বদাই এ-রকম মুহুর্তের জঞ্জাল অপেক্ষা করতো আঘাত হানবার জন্যে। কিন্তু বাংলাদেশের জাগ্রত ছাত্র জনতা এতেও ক্রোধে দাঁড়াল, চুরমার হয়ে গেল ষড়যন্ত্র। এ-রকম পরিবেশেই কবি শামসুর রহমান লিখেছিলেন, তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’।

নক্সাপুঞ্জের মতো জলজলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সন্তায়।

মমতা নামের প্লুত প্রদেশের স্মারলিমা তোমাকে নিবিড়

ঘিরে রয় সর্বদাই। কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে

শিউলি-শৈশবে ‘পাখি সব করে রব’ বলে মদনমোহন

তর্কালঙ্কার কী ধীরোদান্ত স্বরে প্রত্যহ দিতেন ডাক।

তুমি আর আমি অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর মমতায় লীন

ঘুরেছি কাননে তাঁর নেচে নেচে, যেখানে কুসুম কলি সবই

ফোটে, জ্বোটে অলি ঋতুর সংকেতে।

বাঙলার বর্ণমালার একাধিক বর্ণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

সুদূর পাঠশালার একাধিক সতত সবুজ

মুখের মতই দুলে দুলে ওঠো তুমি

বারবার কিম্বা টুকটুকে লক্ষা-টোটা টিয়ে হয়ে

কেমন ছলিয়ে দাও স্বপ্নময়তায় চৈতন্যের দাঁড়।“

[বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা]

বর্ণমালা থেকে শুরু করে বাংলাভাষার প্রতি সবাই শ্রদ্ধা নিবেদন করে-
ছেন। ফজল শাহাবুদ্দিন বাংলাভাষাকে 'মা' বলে সম্বোধন করে লিখেছেন,

আমি একদিন শুনলাম অনেক অনেক মানুষের কণ্ঠ

শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি

জলকল্লোলের মত ঝড়ের শব্দের মতো সমুদ্রগর্জনের মতো

এশিয়ার ক্ষুধার্ত মাটিতে আফ্রিকার লুপ্তিত বনছায়ে

ল্যাটিন আমেরিকার শোণিত প্রান্তরে প্রান্তরে

ভিয়েতনাম এঙ্গেলার মোজাম্বিকে

দক্ষিণ আফ্রিকার হীরক-খনির হিংস্র অন্ধকারে

আর বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে নদীতে পাহাড়ে

শুনলাম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠ

গভীর বলিষ্ঠ, তীক্ষ্ণ উদ্দীপিত এক বিপুল প্রত্যয়ে

মানুষের চিরদিনের সকল অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে

মেতে উঠেছে

স্বাধীনতার দিকে জীবনের দিকে আলোকের দিকে হাত বাড়িয়ে

মানুষ এক অবিস্থাস্ত ধ্বনিতে শপথ নিচ্ছে

জীবনের জন্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন কোরবার

মুক্তির জন্ত নির্ভুরতাকে দীপ্ত কোরবার

সে কী উন্মাদনা মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে

জলকল্লোলের মত ঝড়ের শব্দের মত সমুদ্রগর্জনের মতো

হে বাংলাভাষা আমার, আমি চিরকাল তোমার কাছে

কৃতজ্ঞ থাকবো

তুমি না হলে মানুষের এই উজ্জীবিত অভ্যুত্থানের কথা

আমি কোনদিন উচ্চারণ করতে পারতাম না।^৬

[বাংলাভাষা, মা আমার]

বাংলাদেশ

একুশের রক্তাক্ত ইতিহাস বাংলাদেশের মানুষকে শুধু বাংলা বর্ণমালা আর বাংলা ভাষাকে ভালবাসতে শেখাননি। শিখিয়েছে দেশপ্রেম। দেশকে নতুন করে উপলব্ধি করেছেন সব কবিই। যদিও দেখার ভঙ্গি সকলের একরকম নয়, কিন্তু বাংলাদেশ যেন এই প্রথম সকলের কণ্ঠে কণ্ঠে গান হয়ে উঠল। পাকিস্তানের কুচক্রী শাসক ও শোষক শ্রেণী, বাংলাদেশের নাম পাণ্টে রেখেছিল পূর্ব-পাকিস্তান। কিন্তু ভাবলে অবাক লাগে, গত দুই দশকের কোন কবিতাতে কোন কবিই 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহার করেননি। 'বাংলাদেশ' না বলে অনেকে বলতেন 'পূর্ব-বাঙলা'। খুব সম্ভব 'পশ্চিম-বঙ্গে'র সঙ্গে ভিন্নতা দেখানোর জন্যই এটা করা হ'ত। দেশকে 'মা' বলা ছিল নিষিদ্ধ। বাংলা একাডেমির জনৈক পরিচালক ভাষাতত্ত্বের নানা বই-পুঁথি ঘেঁটে প্রমাণ করেছিলেন যে, মুসলমানদের জন্য দেশকে 'মা' বলে ডাকা নিষিদ্ধ, কারণ আরবী ভাষাতে 'মাতৃভূমি' শব্দটি অনুপস্থিত এবং যেহেতু আরবীরা দেশকে 'পিতৃভূমি' বলে, সেহেতু বাংলাদেশের মুসলমানদেরকেও তাই বলতে হবে। আইয়ুব খানের এক নসরের গোলাম গভর্নর মোনেম খা এই তত্ত্বকে যত্রতত্র প্রচার করেছিল তার আমলে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের কাছে বাংলা বর্ণমালা, বাংলাভাষা ও বাংলাদেশ একটি একক অনন্য সত্তার রূপান্তরিত হয়েছিল আর তাই বাংলাদেশের ছোট শিশু-কিশোরেরা বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বিলিয়েছিল একটি ক্ষুদ্র পোস্টার :

এক একটি বাংলা অক্ষর

অ

এক একটি বাঙালীর জীবন

এই ক্ষুদ্র পোস্টারেই ফুটে উঠেছিল বাঙালী কৃষক-মধ্যবিত্ত-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার জাতীয় মানসিকতা। সুতরাং সরকার এবং দালালদের কোনো চক্রান্তই ধোপে ঢেকেনি। সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও চক্রান্তের বেড়াছালা

ভিন্ন করে বাঙালী জনগণ বাংলাদেশকে মহামহিমায় উপলব্ধি করতে শিখে-
ছিল। কবি সৈয়দ আলী আহসান বাংলাদেশকে দেখেছেন কাব্যিক
দৃষ্টিতে,

আমার পূর্ব বাংলা

আমার পূর্ব বাংলা অনেক রাতে গাছে

পাতার ঝটিক শব্দের মতো

কখন মৃদঙ্গ, হঠাৎ কখনও বেহালা

এক সময় বাঁশির জ্বর

কখন রাতে ঘুম ভাঙে

অনবরত কোমল কোলাহলে

স্বপ্নের মতো পাতার পাতার

শব্দকে দেখি

তার আকুল বিকাশ

অন্ধকার আকাশের চেতনার মতো

যে চেতনা এক সময় অতল অবলুপ্তি

এক সময় কালো চোখের তন্দ্রা

এক সময় হঠাৎ জাগরিত বস্তু

কিন্তু চিরকাল অনেক গন্ধ, অনেক শব্দ এবং

চোখ-চোখে দেখার কথার

ভরপুর।

[আমার পূর্ব বাংলা]

কবি সানাউল হকের দৃষ্টিও কাব্যিক চেতনায় সমৃদ্ধ,

অতিথিবৎসলা, স্পর্শাতুর

আষাঢ়ের মেঘ

হরতো বা গহন কাজল

দীঘি, নিরুদ্বেগ।

কথার আগেই চোখে পানি

ছোবলে বেহলা,

ভেলায় ভাসিয়ে দিয়ে আশা

তরঙ্গ স্বদুল।^৭

[পূর্ব-বাংলা-দুই]

কিন্তু অপেক্ষাকৃত তরুণ কবির শোষিত নির্ধাতিত অবমানিত বাংলা-
দেশের চিত্র এঁকেছেন ভিন্ন দৃষ্টিতে। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী জন্মভূমিকে
অহল্যার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন,

আমার দুঃখিনী বাংলা

মা, তুই আমার জননী

তোর ঐ আকাশে চাঁদ

আর দিনে হাসে দিনমণি।

তবু তোর চোখে কেন অশ্রুভরা জল

মা তুই অহল্যা হ'লি

কার শাপে বল ?

[আমার দুঃখিনী বাংলা]

কবি আল মাহমুদের ভাষার মধ্যে তীব্রতা আরো বেশী,

তাড়িত দুঃখের মতো চতুর্দিকে স্মৃতির মিছিল

রক্তাক্ত বন্ধুদের মুখ উত্তেজিত হাতের টকারে

তীরের ফলার মত

নিষ্কিণ্ড ভাষার চীৎকার

বাংলা, বাংলা

কে নিদ্রামগ্ন আমার মায়ের নাম উচ্চারণ করো ?^৮

[নিদ্রিতা মায়ের নাম]

আল মাহমুদের আর একটি চিত্র,

এ কেমন অন্ধকার বঙ্গদেশ উত্থান রহিত

নৈশব্দের মত্রে যেন ডালে আর পাখিও বসে না

নদীগুলো দুঃখময়, নির্পতঙ্গ মাটিতে জন্মায়।

কেবল ব্যাঙের ছাতা, অথ কোন শ্যামলতা নেই।^৮

[রবীন্দ্রনাথ]

৭ সানাউল হক : বিচূর্ণ আশিতে, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৭৫, পৃঃ ১৭

৮ আল মাহমুদ : কালের কলস, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৩৭৩, পৃঃ ৪৭

ফজল শাহাবুদ্দিনও ঐকেছেন শোষিতা অত্যাচারিতা জননীর ছবি,

এখন ফসল নেই বাংলাদেশে । হাওয়ার ওঠে না

দূলে রাশি রাশি তৃপ্তির শিখর মতো

স্বর্ণরঙ শস্যকণা আর

খামারেতে নেই নেই আকাঙ্ক্ষার সম্পন্ন শরীর

এবং ইদানীং

ক্ষুধার পতাকা এক উড়েছে শুধুই

বিরাট আকাশ জুড়ে আশ্বিনের সুনীল ললাটে

বাংলাদেশে আসে না অগ্নাণ

কিংবা পোষ পার্বণের পালা নাচের মুদ্রায়

কাঁপা কাঁপা হয় না অস্থির ।

[নবান্ন : ১৩৭৬]

বাংলাদেশকে যারা নিবিচারে শোষণ করেছে, তাদের প্রতি তীব্র ধিক্কার
জানিয়েছেন ফজল শাহাবুদ্দিন,

হাওয়ার হাওয়ার কারা কথা বলে কী যে শুধায়

বাংলাদেশের মানুষেরা সব গেলো কোথায় ?

শুনেছি একদা প্রসারিত মাঠে ছিলো ফসল

সকাল সন্ধ্যা পুষ্পিত সেই বাংলাদেশে

এখন ক্ষুধার অজগর নাচে যেখানে এসে ;

কে মোছাবে বলো আমার দেশের চোখের জল ?

আজকের মূর্খ যুক্তের পরিবেশেও শাহাবুদ্দিনের বক্তব্য সত্য হয়ে উঠেছে,

আমরা সবাই প্রাণের চেয়েও বাসি যে ভালো

বাংলাদেশের নদী প্রান্তর আকাশ নীল

দোয়েল কোয়েল ফিঙে হরিমাল পাহাড় বিল

সবখানে যেথা একই ধ্বনি শুনি 'রক্ত ঢালো' ।^৯

[বাংলা আমার স্বপ্ন আমার]

পশ্চিম পাকিস্তানী খুনি 'সীমারেরা' বাংলাদেশে, যে-হত্যালীলা
চালিয়ে যাচ্ছে সেকথা তরুণতর কবি হুমায়ুন কবির ধারণ করেছিলেন
অনুভবে :

কারবলা হয়ে যায় সমস্ত বাংলাদেশ, হায় !

ফজল শাহাবুদ্দিন : আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর, পৃঃ ২৯

কারবালা হয়ে যায় !

নিপত্র সমস্ত বন্ধ, তৃণহীন প্রান্তর হা হা করে,
জল, নেই জল নেই, কান্নাফাটা শিশুদের গ্রীবা,
চতুর্দিকে ঝলকায় কুতাস্ত সীমার,
ভীষণ খঞ্জরে তার বিদ্ধ করে এই বাংলার
আমাকে অন্ধকে ; আর জননীকে
ভীষণ বরণ দেয়, দুঃখ দেয় শুধু ।

তারপরেই কবির শপথ উচ্চারিত হল,

আমি কি পারি না বলো, হানিফার মতো দীপ্ত হয়ে
তীর অশ্বে আরুঢ় বনবনা, ভেঙে ফেলি লোভের প্রাচীর
বাংলার রিক্ত মাটি সিক্ত করি দুরের নহরে
সিক্ত করি শূক কণ্ঠ হিংস্রতার বুকের রুধিরে ॥

[বাংলার কারবালা]

‘হিংস্রতার বুকের রুধিরে’ বাংলাদেশ আজ সত্যিই সিক্ত হচ্ছে । বাংলা-
দেশের মুক্তিসংগ্রাম জরী হতে চলেছে । যে-বাংলা বর্ণমালা, যে-বাংলা-
ভাষা এবং যে-বাংলাদেশকে আমরা অসম্মানিত হতে দেখেছি, তা প্রতিদ্বিধ
হয়েছে মহৎ মর্যাদায় ।

উনসত্তরের বিপ্লব

১৯৪৮ সাল থেকে বাংলাদেশে আন্দোলনের যে মহত্তর ধারাটির সৃষ্টি হয়, প্রতিটি বছর তাতে কিছু না কিছু অবদান যোগায়। ১৯৬৯ সালের আইয়ুব-বিরোধী বিপ্লবের মধ্যে ২৩ বছরের আন্দোলনের ধারা একটি মহাশোভে মিলিত হয়। আইয়ুবের কুখ্যাত ‘কালো দশক’ ও তার মৌলিক গণতন্ত্র (Basic Democracy) চিরদিনের মত সমাধিস্থ হয়। শেখ মুজিবুর ‘ছয় দফা’র আন্দোলনকে জোরদার করলে, আইয়ুবশাহী তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে—যে মামলা ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’ নামে পরিচিত হয়েছে। এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলাদেশের সমগ্র জনতা। কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত ও ছাত্র-সমাজ বাংলাদেশে সেদিন ক্ষমতা দখল করেছিল সত্য, কিন্তু ক্ষমতা হাতে রাখার মতো সংগঠন দেশে তখন ছিল না। পুলিশ ও সামরিক বাহিনী সেদিন পরাজয় মেনেছিল, ঢাকায় ছাত্ররা সেদিন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেছে, গ্রামাঞ্চলে সামন্তবাদী, সুদখোর, মহাজন ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নোঙ্গার হয়ে ওঠে মানুষ। জনতার রুদ্ধরোধ ফেটে পড়ে দিগ্বিদিকে। চোর, খুনী, গুণ্ডা, বদমাস—যারা পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশে জনগণকে শোষণ করেছে এতকাল, জনতার আদালতে তাদের বিচার হয়—তাদেরকে উৎখাত করা হয় সমস্ত দেশ থেকে। এই উনসত্তরের গণবিপ্লব একটা প্রচণ্ড প্রেরণা পেয়েছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সামসুজ্জোহার যত্নে। আজ ভাবলে অবাক লাগে, কি বিশাল সম্ভাবনাময় একটা বিপ্লব সংগঠনের অভাবে বিনষ্ট হয়েছিল। আইয়ুব ঝাঁপ দিলে ক্ষমতাচ্যুত হল বটে, কিন্তু তার জায়গায় অধিষ্ঠিত হল আজকের হত্যা-মহাযজ্ঞের পুরোহিত ইয়াহিয়া খান। ১৯৬৯ সালেই ছাত্রসমাজের রচিত ১১-দফা সমগ্র বাঙালী জাতি মুক্তি-সনদরূপে চিহ্নিত হল। এই ১১-দফার মূল চরিত্র ছিল সামন্তবাদ-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। ১৯৭০ সালে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন ইয়াহিয়া খান। ১৯৭০ সালেই সংঘটিত হল অরণকালের বৃহত্তম সাইক্লোন। বাঙলার দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলা ও দ্বীপাঞ্চলগুলোতে পনেরো থেকে কুড়ি লক্ষের মত মানুষ নিহত হল। ১৯৭১ সাল থেকেই

বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। কখনও রাজনৈতিক আন্দোলন, কখনো প্রাকৃতিক মহাদুর্যোগ বাংলাদেশকে পরিণত করে বিশাল বিশাল সংবাদে। আর আজ এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বের বিশ্বয় হয়ে উঠেছে।

কবি শামসুর রাহমান উনসতুরের ফেব্রুয়ারীতে লিখেছেন,

আবার ফুটেছে ঝাঞ্ঝা কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হয়ে কখনও মিছিলে কখনও বা
একা হেঁটে যেতে মনে হয়, ফুল নয়, ওরা
শহীদের ঝলকিত রক্তের বৃষ্টি, স্মৃতি-গন্ধে ভরপুর
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ।

.....

আমি আর আমার মতই বহুলোক
রাত্রিদিন ভুলুঙিত ঘাতকের আস্তানায়, কেউ মরা, আধমরা কেউ
কেউ বা ভীষণ জেদী, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া চতুর্দিকে
মানবিক বাগান, কমলবন হচ্ছে তছনছ।
বুঝি তাই উনিশশো উনসতুরেও
আসাদ ছালাম নামে রাজপথে, শূণ্যে তোলে ফাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।^{১০}

[ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯]

উনসতুরের প্রথম শহীদ আসাদ, নরসিংদীর বিপ্লবী সন্তান আসাদ। এই আন্দোলনেই শহীদ হয়েছিলেন মতিউর, আনোয়ারা এবং আরও অসংখ্য ভাইবোন। এই আন্দোলনের সময়ে আগরতলা মামলার বিচারাধীন বন্দী সার্জেন্ট জহুরুল হককে নির্মমভাবে হত্যা করে পাক-সেনারা। আসাদের রক্তমাখা শার্টকে উপলক্ষ করে কবিতা লিখেছেন শামসুর রাহমান,

মাঝের উঠোন ছেড়ে এখন সে শার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি-চুড়োয়
গমগমে অভিন্যর আনাচে কানাচে

১০ শামসুর রাহমান, নিজবাসভূমে, পৃঃ ১১

উড়ছে উড়ছে অবিরাম

আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-বলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,

চৈতণ্যের প্রতিটি মোচাঁয় ।

আমাদের দুর্বলতা, ভীকতা, কলুষ আর লজ্জা

সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বয় মানবিক ;

আমাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা ।^{১১}

[আমাদের শার্ট]

উনসত্তরের হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করে এনামুল হক লিখেছিলেন,

কিসে প্রতিবাদ করি এ-হত্যার কারবারীদের

এদের ঘৃণাও করা মনে হয় বাহুল্য খরচ ।

[বিদেশ থেকে চিঠি]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদ ডঃ শামসুজ্জোহার মৃত্যুতে ব্যথিত
কবি মুস্তাফিজুর রহমান লিখেছিলেন,

বীতসে সত্যের মতো

একনিষ্ঠ উদাসীন নিঃশব্দ

হে বন্ধু, তুমি জেগে আছো

যেখানে শুরু দিন সূর্যের আগুনে

কালোপথ রক্তলাল সংগীতে যেখানে

নির্জন মর্মরিত ইউক্যালিপটাস

এক, দুই, তিন-অনেক অনেক ।

[হে বন্ধু তোমাকেই]

শহীদ শামসুজ্জোহার কবর দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন-ভবনের
সামনে অবস্থিত গোল চত্বরে । তাঁর শিরে আছে তিন তিনটি ইউক্যালিপ-
টাসের চারা । এর ঠিক কিছু দূরে নিমিত হয়েছে একুশের শহীদদের স্মরণে
শহীদ মিনার । একই বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে দুই মহাতীর্থ ।

^{১১} শামসুর রাহমান, নিজবাসভূমে, পৃঃ ১৪

এপার বাঙলা ওপার বাঙলা

১৯৪৭ সালে বাঙলাকে ভাগ করা হয় শারীরিক দিক থেকে কিন্তু উভয় বাঙলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য বন্ধনকে অস্বীকার করা সম্ভব হল না। হিন্দু-মুসলমানের ঘৃণা দেশবিভাগের পর পরই থামেনি বটে, এমন কি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাও হয়েছে দুই বাংলায়, তবু ক্রমাগত সাম্প্রদায়িকতা পরাজিত হয়েছে। এ-বাঙলার মানুষ ও-বাঙলার মানুষের কাছে বাড়িয়ে দিয়েছে বন্ধুত্বের হাত ও-বাঙলার মানুষ ছুঁয়ে দিতে চেয়েছে এ-বাঙলার হৃদয়কে। বাঙলাদেশের নেতা এ. কে. ফজলুল হক, মোলানা ভাসানী, মণি সিং, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, খীরেন্দ্র দত্ত, শেখ মুজিবুর রহমান সবাই একদিন কলকাতার জীবনের সঙ্গে ছিলেন জড়িত। ফজলুল হক আমৃত্যু ভুলতে পারেন নি পশ্চিমবঙ্গকে। মোলানা ভাসানী ভোলেন নি গান্ধীজী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, নেহেরুজীর স্মৃতিকে। মহারাজ ঐলোক্যনাথ চক্রবর্তীর আজীবনের বিপ্লবী সঙ্গীরা ছিলেন এপার বাঙলায়। মণি সিং-এর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল এপার বাঙলা-ওপার বাঙলায়। তেমনি ওপার বাঙলার প্রখ্যাত নেতারা চলে এসেছিলেন পশ্চিম বাঙলায়। কেউ কি কাউকে ভুলতে পেরেছিলেন? না। রাজনৈতিক দিক থেকে আলাদা হয়ে গেলেও সাংস্কৃতিক বন্ধন ছিল। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি জসিম উদ্দীন, অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন, শিশু-সাহিত্যিক নাসির আলী, শিলাচাঁর জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান এবং বহু প্রখ্যাত অধ্যাপক একদিন কোলকাতাতেই লেখাপড়া শিখেছেন, অথবা কোলকাতাই ছিল তাঁদের কর্মস্থল। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ বহু সাহিত্যিকের জন্মভূমি ছিল পশ্চিমবঙ্গ। কাজেই উভয়বঙ্গের মধ্যে সাংস্কৃতিক রাখীবন্ধন কখনও বিনষ্ট হয় নি।

কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যে-তরুণ সাহিত্যিক গোষ্ঠী আবির্ভূত হয়, পশ্চিমবাঙলার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তাদের আগ্রহ ও আকর্ষণ দেখা দেয় একান্ত স্বাভাবিক কারণে। রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী এবং বিষ্ণু দেব কবিতা তরুণদের কাছে

প্রিয় হয়ে উঠে। অতীতের স্বকান্ত ভট্টাচার্য ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মীদের কাছে ছিলেন প্রেরণার উৎস। করাচী-পিণ্ডির সরকার-গুলো এই সাংস্কৃতিক ঐক্য ও বন্ধনের খবর রাখত, ফলে বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তান। ভারতীয় লেখকদের বই, পুথি এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রের আমদানি এ-কারণেই বন্ধ করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করবার মূলে ছিল এই একই কারণ। কিন্তু অতীতের বাংলাদেশের তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা নির্ভয়ে ঘোষণা করেছিলেন অবিভক্ত বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য সবটাই বাংলাদেশেরও সাধারণ ঐতিহ্য। করাচী-পিণ্ডির সরকার রাষ্ট্র-যন্ত্রটিকে নির্মমভাবে সাম্প্রদায়িক প্রচারণার কাজে লাগালেও বাংলাদেশের বাঙালীরা সেকথা অগ্রাহ্য করেছে বারংবার। রেডিও পাকিস্তান, পাকিস্তান টেলিভিশন, পাকিস্তান কাউন্সিল, পাকিস্তানের সরকারী প্রচার দপ্তর কৃষ্ণচূড়ার পরিবর্তে ‘গুলমোহর’, রামধনুর পরিবর্তে ‘রঙধনু’, ঈশ্বরের পরিবর্তে ‘আল্লাহ’ চালু করার প্রয়াস করলেও তা ছিল সরকারী দপ্তরেই সীমাবদ্ধ। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নজরুলের কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ যেমন ‘ভগবান’ কেটে ‘রহমান’ এবং ঋগ্বেদী সঙ্গীতে ব্যবহৃত ‘কৃষ্ণ’র স্থলে আল্লাহ ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেও, তা কেউ মানে নি। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য (Folk tradition) যথাযোগ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিতার অঙ্গে অঙ্গে স্থান পেয়েছে। সর্বভারতীয় ঐতিহ্যকেও আত্মস্মরণ করার প্রচেষ্টা ছিল অব্যাহত, অন্তত সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত হয়েছে। সমস্ত বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও ওপার-বাঙলার শিল্পী-সাহিত্যিকরা এপার-বাঙলার শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাছে গোপনে গোপনে বই ও পত্র-পত্রিকা পাঠিয়েছেন। এপার-বাঙলার শিল্পী-সাহিত্যিকেরাও একইভাবে বই-পুথি ও পত্র-পত্রিকা পাঠিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত নিষিদ্ধ হয়েছিল বটে কিন্তু বাংলাদেশের কবিরা একাধিক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং করেছেন এমন ভাষায়, যার তুলনা মেলা দায়ঃ কবি সিকান্দর আবু জাফর লিখেছিলেন,

আমাকে বেঁটন করে আছে
অবিশ্বাস অদৃষ্টের মতো
প্রতিমুহূর্তের বর্জনের প্রয়াসে থিতুত
অনিবার্য অভ্যাসের মতো।

[রবীন্দ্রনাথ]

কবি আতাউর রহমান লিখছেন,

তোমার কাব্যের মত ছন্দে রূপে রসে ভরা দেশ
তোমার গানের মত পেলব মধুর স্বপাবেশ
কত রাত কত দিন, এ-মনের কল্পনার ঘারে
প্রথমে প্রেমের মত বার বার আসে অভিসারে ।^{১২}

[রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে]

রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়ার পর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনায়াসে শিল্পী ফাহিমদা
খাতুনের উদ্দেশ্যে শামসুর রহমান লিখলেন,

ফাহিমদা সুর ভাঁজে এও এক স্বটি অপকল্প,
অস্তিত্ব ডুবিয়ে নামে । গীত-বিতানের কিছু নিভৃত নিশ্চুপ
পাতা ওড়ে অলৌকিক কলরবে, গাংচিলের মতো ঘোরে সারা ঘরে
প্রাণের উমিল জল ছুঁয়ে যায় কতো ছল ভরে ।

... ..

কখন যে রাজি বাড়ে আলো-অঁধারিতে তেতলায়
কিছুই পাই না টের সুরে ভেসে, ফাটে ফাহিমদার গলায়
আমার সোনার বাংলা বলমল করে ওঠে । ঋণী তাঁরই কাছে
আজীবন ; কঠে যঁার বারবার রবীন্দ্রনাথের গান বাঁচে ।^{১৩}

[ঋণী]

হতসর্বস্ব বাংলাদেশকে চোখের সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে একটি
অপূর্ব কবিতা লিখেছিলেন আল মাহমুদ,

শুনুন রবীন্দ্রনাথ, আপনার সমস্ত কবিতা
আমি যদি পঁতে রেখে দিনরাত পানি ঢালতে থাকি
নিশ্চিত বিশ্বাস এই একটিও উড়িদ হবে না
আপনার বাংলাদেশ এরকম নিষ্ফলা ঠাকুর ।^{১৪}

[রবীন্দ্রনাথ]

১২ আতাউর রহমান, দুই ঋতু, ঢাকা, ১৩৬৩ সাল, পৃঃ ৭

১৩ শামসুর রহমান, নিজবালভূমে, পৃঃ ৪৩

১৪ আল মাহমুদ, কালের কলস, পৃঃ ৪৬

আবুবকর সিদ্দিকের অভিজ্ঞতাও করুণ,

যতক্ষণ তোমার বাসায়

পোষা ছিলেম

শরীর ঊষ ছিল,

তারপর মাটিতে পা দিতেই

আগুন আগুন।^{১৫}

[রবীন্দ্রনাথের নামে]

তরুণতর কবি নিরামত হোসেন ভীষণ সোচ্চার হয়ে বলেন,

আমাকে কুচি কুচি করে কাটলেও

রক্ত মাংস সবটুকুই

বাঙলা

হৃদয়ের দুঃখ শোক প্রেম শান্তি সবটুকুই

বাঙালী

... ..

অনেক সেক্সপীয়ার দান্তে তলস্তয়ের স্মৃতিতে

মাথা নীচু হয়

কিন্তু আমার হৃৎপিণ্ডের রক্তধারায়

গোটা একটা রবি ঠাকুর।

[রবীন্দ্রনাথের প্রতি]

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে মুগ্ধ তরুণ কবি হুমায়ুন কবির লিখলেন,

অপরাজে শান্তি এলে রষ্টির করুণ ধারা বেয়ে

শ্মশানে বাসকপাতা দ্রোণ-ফুলে দক্ষিণার হাত

জ্যোষ্ঠের বিকেলে রষ্টি, রষ্টি করে নিবিড় সেতার।

রষ্টিতে একাকী ঘরে নিঃসঙ্গে ও তন্দ্রার ভিতরে

ব্যথিত বাউলে ডাকি সন্ধ্যাটের মত যার মুখ

‘বাজাও বিষণ্ণ সুর আকাশের বৃকের কথার।

সারাটি প্রহর জুড়ে বাক্য নরনে বৃকে চেতনার গালে’।

[রবীন্দ্র-সংগীতে রষ্টি]

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উভয় বঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতির মহান সেতু । কবি জিয়া
হারদারের কথাই সত্য বটে,

আমার অস্তিত্বে তুমি ঈশ্বরের মতো ।

নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের মানুষ পেয়েছিল সংগ্রামের বন্ধু হিসেবে ।
স্বকান্ত-সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে পেয়েছিল সৈনিক-কবি হিসেবে । নজরুলের
উদ্দেশ্যে শামসুর রহমান লিখেছিলেন,

কাবেরী নদীর জল, পদ্মার উত্তাল ঢেউ প্রশ্ন করে আজো

কেমন আছেন নজরুল ইসলাম ?

বাদুড় বাগান লেন এবং মন্ডাথ দত্ত রোড

বেলগাছিরার

প্রতিটি সকাল আর প্রতিটি সন্ধ্যায় করে প্রশ্ন :

কেমন আছেন নজরুল ইসলাম ?

সারা বাংলাদেশের ব্যাকুল কণ্ঠে সেই একই প্রশ্ন

কেমন আছেন নজরুল ইসলাম ? ১৬

[কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি]

চট্টগ্রামের কবিরাজ রমেশ শীল উভয় বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার
কথা একদিন তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন । সেই মহান স্বাধীনতা-সংগ্রামী
রমেশ শীল সম্বন্ধে লিখেছেন শামসুর রাহমান,

স্বদেশকে প্রিয়ার একান্ত নাম ধরে ডেকে ডেকে

অগ্নিবলয়ের মধ্যে গড়েছিলে প্রেমের প্রতিমা

নিজে পুড়ে পুড়ে ।

তোমার প্রেমার্ত্ত স্বর পঞ্চানন হাজার

একশো ছাব্বিশ বর্গমাইলের আনাচে কানাচে

পৌঁছে গেছে । বাউলের গেরুয়া বস্ত্রের মতো মাটি, মাঠ আর আকাশের
কাছে

নদীর বাঁকের কাছে, মজুরের ক্রিপ-পেশী, অত্যাচারী শাসক-দুপুরে
কৃষকের হাল-ধরা মুঠোর কাছেই তুমি শিখেছিলে ভাষা । ১৭

[কবিরাজ রমেশ শীল]

১৬ শামসুর রাহমান. নিজবাসভূমে, পৃঃ ৩১

১৭ প্রান্তর, পৃঃ ৩৩

মুহম্মদ শহীদুল্লাহের প্রতি শামসুর রাহমান শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আর এক ভাষায়,

দুশ্চরিত্র সময়ের কাছে নতজানু হতে কেউ
জ্বাখে নি কখনো ; আপনার আচকান পেয়েছে সক্ষম পাখা
নিকলুষ নীলিমায় । হে বিজ্ঞা, হে প্রজ্ঞা, মনীষার মন্বন্তরে
ছিলেন বিপুল অন্নসত্র, যে-যেমন নিয়েছে অঞ্জলি পেতে বারবার ।
এখন আছেন গ্রন্থে, বাংলার স্মৃতিতে জলজলে দরোজায় । ১৮

[গ্রন্থে আছেন শহীদুল্লাহ]

বাংলার কৃষক-শ্রমিক জনতার আর একজন নেতা ছিলেন, এ. কে. ফজলুল
হক—যিনি দুই বাংলার বন্ধু ছিলেন, আছেন এখনও, যত্নের পরেও । কবি
আবুল হোসেন তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন,

সে ছিল দেশের আগে

কিষ্কা দেশ ছিল তার, কে কবে ভেবেছে ? দিয়েছে সে
সবই তার যা ছিল দেবার । ভালোবেসে শুল্ল হাতে
ফিরতেও তার বাধে নি কখনো । তাই আজীবন
হৃদয়ের উষ্ণতা বজায় রাখতে সে পেরেছিলো
প্রেমের আগুন । আর যতবার জিতেও হেরেছে
দেশ তাঁকে বসিয়েছে সিংহাসনে তার । ১৯

[বাংলার বাঘ]

তাঁর কথা বলতে গিয়ে ফজল শাহাবুদ্দিন বলেছিলেন,
তোমার স্মৃতিকে কোনদিন পারবো না ভুলে যেতে
তুমি এক কিংবদন্তী অন্তরঙ্গ গৃহে-গঞ্জে খেতে । ২০

[শেরে বাংলার স্মৃতি]

মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কবি দিলওয়ার হোসেন,
মহাত্মাজী, সাগর পারের খুনীদের কণ্ঠে
তোমার জয়ধ্বনি শোনো,

১৮ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯

১৯ আবুল হোসেন, বিরস সংলাপ, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৭

২০ ফজল শাহাবুদ্দিন, আকাংক্ষিত সুলয়, পৃঃ ৩৫

সাপের উদ্ভূত ফণায় তোমার মাল্যদানের কথা
তারা তো ভুলতে পারে না কখনো ।

[মহাত্মাজীর প্রতি ভগৎ সিং]

দিলওয়ার আশা প্রকাশ করেছিলেন গান্ধীজীর আয়ু দীর্ঘ হলে 'রাম-রহিমে'র
বন্দ চিরকালের জন্য যুচে যেত । যাই হোক, বাঙলাদেশের কবিরা বাঙলা ও
বাঙালীর সুবিশাল ঐতিহ্যকে কখনো ভোলে নি ।

স্বপ্না, বিক্রম, ক্রোধ, হরতাল, মিছিল, মৃত্যু ও সংগ্রাম

‘পাকিস্তান’ নামক যে রাষ্ট্রটির আজ বাস্তবত মৃত্যু ঘটেছে, সেই রাষ্ট্রটির একটি জাতীয় সঙ্গীত ছিল, তার অর্থ কোনো বাঙালী সন্তানের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। ‘পাকিস্তান’ নামক এই রাষ্ট্রটি তাই সকলের স্বপ্নাই কুড়িয়েছে। পশ্চিম-পাকিস্তানী পুঁজিপতিরা বাঙালীদের কাজ থেকে ঘৃণা ছাড়া কিছুই পায় নি। কবি সিকানদার আবু জাফরের চোখে পাকিস্তান ছিল একটি ‘অবাক দেশ’ আর এই ‘অবাক দেশ’-এর জন্য তিনি একখানি জাতীয় সঙ্গীত লিখেছিলেন.

মূল গায়ন : আমাদের সব আছে ভাই সব আছে

সাজ আছে রূপসজ্জা আছে

গরজ মত গলায় গলায়

দোহার : হুকা হুয়া রব আছে।

সকলে : হুকা হুয়া রব আছে।

সব আছে ভাই সব আছে।

মূল গায়ন : আমাদের শ্মশান আছে গোর আছে

দোহার : গোর আছে

মূল গায়ন : ডাকাত আছে চোর আছে

দোহার : চোর আছে

মূল গায়ন : ভাবনা জুড়ে অষ্ট প্রহর

কেয়ামতের ঘোর আছে।

সকলে : কেয়ামতের ঘোর আছে

আমাদের সব আছে ভাই সব আছে।

‘অবাক দেশ’র এই জাতীয় সঙ্গীতের শেষ বক্তব্য ছিল বস্তুত আমরা স্বাধীনও নই। ঘৃণাকে বিক্রমের তীব্র কশাঘাতে মুক্ত করেছিলেন সিকানদার আবু জাফর,

মূল গায়ন : শুষু নেই ত রে ভাই খুলির খোলায়

একটি ছটাক ঘৃত

তাই বলে কি আমরা সবাই

পশুর খাঁচায় মত ?

সকলে : তাই বলে কি আমরা সবাই

পশুর খাঁচায় মৃত ?

দোহার : না, না আমরা স্বাধীন

সকলে : আমরা স্বাধীন

তবলার বোল : ধাগে ধিনাগ তা কেটে ধিনাগ

তাক তাক তাক ধিনাগ ধিনাগ

দোহার : আমরা স্বাধীন আমরা আজাদ

তবলার বোল : ধাত্রেকে ধিনাগ তাত্রেকে ধিনাগ

তাক তাক তাক ধিনাগ ধিনাগ । ২১

[অবাক দেশের জাতীয় সঙ্গীত]

এই অবাক দেশের অধিবাসীদের কথা স্মরণ রেখেই শামসুর রাহমান জন্ত-
জানোয়ার কীটপতঙ্গদেরকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন,

কোকিল, কুকুর, হাঁস, টিকটিকি ইত্যাদি ইত্যাদি

আটক করে না জেলে তোমাদের কেউ কিম্বা

গোয়েন্দা নেয় না পিছু, তোমাদের অলিতে গলিতে

কারফু হয় না জারী অতকিতে । তোমাদের কেউ

করে না শোষণ কোনদিন ; কেননা তোমরা নও

ঈর্ষানীয়া সেই জাতি বস্ত্র মানব যার নাম । ২২ [প্রকারভেদ]

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যে জন্ত-জানোয়ার বা কীটপতঙ্গের স্বাধীনতা-
টুকুও ভোগ করে নি, সেকথা গোপন করেন নি বাংলাদেশের আধুনিক কবিরা ।

আইয়ুব খানের রাজত্বে কারো কথা বলবার ঘো ছিল না । গোটা দেশটার মানুষকে
'ভেড়ার পালে' রূপান্তরিত করা হয়েছিল, কখনও ভয় দেখিয়ে, অত্যাচারের
শ্রোত বইয়ে দিয়ে এবং খেতাব-পদবী বিলি করে, আর কখনো প্রত্যক্ষ ঘুষ দিয়ে ।

শামসুর রাহমান লিখেছেন,

২১ আ, ফ, ম, সিরাজউদ্দৌলা চৌধুরী (সম্পাদিত) রূপরজ চট্টগ্রাম, ১৩৭৫, পৃঃ ৬৭

২২ শামসুর রাহমান নিজবাসভূমে, পৃঃ ৭৪

ধন্য রাজা ধন্য,

দেশজোড়া তার সৈন্য।

পথে ঘাটে ভেড়ার পাল।

চাষীর গরু, মাঝির হাল

ঘটি-বাটি, গামছা, হাঁড়ি,

সাত-মহলা আছে বাড়ি,

আছে হাতি, আছে ঘোড়া

কেবল পোড়া মুখে পোরার

দু মুঠো নেই অন্ন

ধন্য রাজা ধন্য !^{২৩}

[রাজকাহিনী]

এগুশের চিত্র এঁকেছেন আবুল হোসেন, এ-যেন 'রাজকাহিনী'র দ্বিতীয় ভাষ্য। দেশে অন্ন নেই, কৃষকের উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নেই, কিন্তু :

এদিকে হাজার হাতের খোরাক চাই রাজার

উজির যাবেন নথিয়াগলি

লে আও হাওয়াই জাহাজ, লে আও টাকার থলি ;

সফর করতে লাট আসেন

ভক্তরা সব কামান দাগেন, ডিনার দেন

টাকা দেবে তো সে গৌরী সেন।^{২৪}

[গৌরী সেন]

আবুল হোসেনের 'বাজার দর' কবিতায় মানুষের মূল্য কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, তার পরিমাপ আছে,

খাওয়ার জিনিস, শোয়ার জিনিস

পরার জিনিস, মরার জিনিস

কিছু ছোঁয়ার সাধ্য নাই,

ঘাটতি কেবল যেদিক চাই।

অভাব শুধু নাই মানুষের,

চাই কত মন চাই কত সের

আঙা চাও, বাচ্চা চাও

জোরান, বুড়ো আসল ফাও

SHAHIDUL MAZID MUNNA
72/B Malibagh Chowdhurypara
Dhaka-1219, Phone : 414706

২৩ প্রাণ্ডিত, পৃ: ৬৩

২৪ আবুল হোসেন, বিরস সংলাপ, পৃ: ৩৩

চাহিদা নাই মানুষগুলার

কেবলি তার পড়ছে বাজার।^{২৫}

[বাজার দর]

আবুল হোসেন শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন একটি অক্লান্ত কায়দার,

নাও যা যা পারো নিতে

চৌদ্দ পুরুষের ভিটে

গোয়ালের গরু

ঘরের মা-বোন জরু

ছেলের মেয়ের শব

সাহেব, দিয়েছি দেবো সব।

...

...

...

...

ঝাঁকরা বুকের মধ্যে শুধু

অলবে আগুন ধু ধু

থাকবে দু চোখ ভরা ঘৃণা

সে তো আর নিতে পারবে না।^{২৬}

[দেবো সব দেবো]

সত্যি পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিরা আমাদের সব নিয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের ঘৃণা অলে উঠেছে অগ্নিগিরির মত। কিন্তু ঘৃণার সঙ্গে যুক্ত হল সংগ্রামী মনোভাবের—সভার, মিছিলে, হরতালে, উত্তাল আন্দোলনে ফেটে পড়েছিল বাংলাদেশ। আমাদের কথারা, শপথেরা, আমাদের মনন আর ধ্যানেরা, আমাদের করনা এবং সাহসেরা মুক্তি পেয়েছিল। বাংলাদেশের কবিরা (দু' একজন ব্যতীত) বাংলাদেশের জনগণের সঠিক মনোভাবকে কবিতায় রূপায়িত করেছিলেন। বস্তুত গত দুই দশকের আধুনিক কবিতা এক অর্থে কালের দলিলও বটে।

কবি শামসুর রাহমান একজন রাজনৈতিক কর্মীর চিত্র এঁকেছিলেন নিপুণ হাতে। প্রতিবেশী একজন বুড়ো তাঁকে দেখলেই বলতেন, 'ছেলেটা পাগল নাকি?' এবং বলা বাহুল্য এই পাগল ছেলেগুলোই গত চব্বিশ বছর ধরে প্রাণ দিয়ে দিয়ে দেশপ্রেমের অনিবার্ণ শিখা জালিয়ে রেখেছিল। ছেলেটার বাড়ি

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ: ৯

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৯

ফেরার ঠিক-ঠিকানা ছিল না, ক্লক চুল, জুতোয় কাদা মাখা, নড়বড়ে চৌকিতে
তার শোয়া, খায় কি না-খায় তারও ঠিক নেই, কিন্তু,

হারিকেন

শিয়রের কাছে টেনে বই পড়ে, আর ভাবে কী-কী অহিফেন
জনসাধারণ আজ করছে সেবন বিদ্রোহের চোমাখায়।

জাথে সে কালের গতি মার্কস আর লেনিনের প্রসিদ্ধ পাতায়।

...

...

...

...

...

‘ছেলেটা পাগল নাকি?’ প্রতিবেশি বুড়ো বললেন খনখনে
কণ্ঠে তাঁর। ‘পাগল নিশ্চয়, নইলে ঘরের নির্জনে

কেন দেয় নি সে ধরা’, ভাবেন লাঠিতে ভর দিয়ে বুড়ো,

নইলে কেউ বুঝি

মিটিং-মিছিলে যায় যখন তখন? সব পুঁজি

খোওয়ার, ঘরের খেয়ে তাড়ায় বনের মোষ? জীবনের সকাল বেলায়

গোলাপের মতো তাজা প্রাণ জনপথে হারায় হেলায়?’^{২৭}

[ছেলেটা পাগল নাকি?]

গত দুই দশকে বাঙলাদেশে (বর্তমান মুক্তিগ্রামের কথা বাদ দিলেও) কত
মানুষ-যে শহীদ হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিশোর থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত রাস্তায়
দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে শোষণের বিরুদ্ধে, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে। একটি স্মৃতির
ছড়ায় আল মাহমুদ তুলে ধরেছিলেন সেকথা,

কারফিউ রে কারফিউ

দুরার খোলে কে

রাঙা বরণ ছেলেরা লাল

নিশান তুলেছে,

লাল মোরগের পাখার ব্যাপট

বাজলো খোয়াড়ে

উটকো মুখো শাস্ত্রী বেটা

হাঁটছে দুয়ারে।

খড়খড়িতে চোখ রেখে কে

বেড়াল ডাকে মিউ

২৭ শামসুর রাহমান, নিজবাসভূমে, পৃঃ ৫৮

খোকন সোনার ভেংচি খেয়ে
পালালো কারফিউ। ১৮

[কারফিউ]

লড়াই করতে গিয়ে কত খোকন সোনা প্রাণ হারিয়েছে। বড় বেশী মনে
পড়ছে স্কুলের কিশোর-ছাত্র মতিউরের কথা। মনে পড়ছে উনসন্তুরের
আন্দোলনে রাজশাহীর একটি শিশু গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়েছিল হাসপাতালে। চার
মাস পর তার মৃত্যু হয়েছিল। কী বিবর্ণ শাদা সেই মুখ! কিছুতে ভোলা
যায় না। এদের কথা স্মরণ করেই শামসুর রাহমান কি লিখেছিলেন,

এ লাশ আমরা রাখবো কোথায় ?

তেমন যোগ্য সমাধি কই ?

স্থতিকা বলো, পর্বত বলো

অথবা সুনীল সাগর জল

সব কিছু হেঁদো, তুচ্ছ শুধুই।

ভাইতো রাখিনা এ লাশ আজ

মাটিতে পাহাড়ে কিংবা সাগরে,

হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই ॥ ২৯

[এ লাশ আমরা রাখবো কোথায় ?]

বাঙলাদেশের আধুনিক কবিরা শুধু বাঙলাদেশের মর্মবেদনাকে কবিতাতে
তুলেই ধরেন নি, প্রাণও দিয়েছেন। কবি শহীদ সাবের আজ আর আমাদের
মধ্যে নেই। গত ২৫-এ মার্চ যখন ইয়াহিয়ার জঙ্গাদ সেনাবাহিনী ঢাকার বৃকে
কামান-বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন শহীদ সাবের ছিলেন দৈনিক 'সংবাদ'-এর
কার্যালয়ে। সমস্ত কার্যালয়টি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয় আর সেই সঙ্গে
পুড়ে যান কবি শহীদ সাবের। তাঁর যে বিখ্যাত কবিতাটি 'শোকাক্ত মায়ের
প্রতি' তিনি জেলে বসে লিখেছিলেন, তা ছিল ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ-
বিরোধী চেতনার একটি মহান প্রতীক। ইলা মিত্রের ওপর রাজশাহী
জেলখানায় যে নির্যাতন চলেছিল, সেকথা স্মরণ করেই কবি শহীদ সাবের
লিখেছিলেন কবিতাটি। ইলা মিত্র একদিন ছিলেন সাঁওতাল ও তেভাগা
আন্দোলনের নেত্রী। এপার-বাঙলা ওপার-বাঙলার তিনিও একটি সেতু।

২৮ একুশে স্মরণে (সম্পাদিত), পৃঃ ১৪

২৯ শামসুর রাহমান, নিজবাসভূমে, পৃঃ ৬৩

শহীদ সাবের একজন রুশ মাতা অলগার ওপর কিভাবে ফ্যাসিস্টরা বর্বর অত্যাচার করেছিল, কিভাবে গর্ভবতী অলগা-মাকে অনাবৃত করেছিল, কিভাবে তার সদ্যোজাত সন্তানকে হত্যা করেছিল—তার বর্ণনা দেবার পর ইলা মিত্রের ওপর অহুষ্টিত বর্বরতার বর্ণনা দিয়েছিলেন। আজ যখন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে লড়ছে, আজ যখন বাঙালী মা-বোনদের ইজ্জতের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানছে শত্রু সেনারা, তখন সাবেরের কবিতাটির প্রতিটি শব্দ, বর্ণ, বাক্য নতুন দ্যোতনা পেয়েছে। মা অলগা ছিলেন গেরিলা বাহিনীর মহান নায়িকা, ইলা মিত্র ছিলেন সাঁওতাল আন্দোলনের মহান নেত্রী। শহীদ সাবের অলগা মায়ের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন,

মা গো ইউক্রেনের বাচ্চা ছেলেরা

তাদের অলগা মাকে কখনো ভুলবে না।

মা গো, তুমি তো তাদের মা

স্বর্গাদপি গরীবসী।

তাদের কথা তুমি জার্মানদের বলো না

মাগো কিশোর গেরিলাদের জীবন-মরণ করছে নির্ভর

তোমার একটি কথার উপর।

গেরিলারা কোথায়? উত্তরে? পূর্বে?

কোন দিকে কোন জঙ্গলে?

বলো না। বলো না।

বলো শুধু, তারা সারা ছুনিয়ায়।

সাবের ইলা মিত্রকে ‘মা’ বলে সম্বোধন করে লিখেছিলেন,

জমি দখলের লাগি যারা লড়ে,

তারা কোথায়? তারা কোথায়?

ইলামাতা বলবে না তা

দারোগা তোমার যতই ভয় দেখাক বলাৎকারের

সে তো তোমার একার লজ্জা নয়কো মা।

[শোকাক্ত মায়ের প্রতি]

না, ইলা মিত্রের একার লজ্জা নয়, আজ বাংলাদেশে নারী-ধর্ষণ, শিশু হত্যা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যপার—এ-লজ্জা সারা বিশ্বের। ভাই শহীদ সাবের আজ নেই। এ কবিতা তাঁর কৈশোরের লেখা। কিন্তু বাংলাদেশের

মুক্তিসংগ্রামের কথা যেন জানতে পেরেছিলেন তিনি। ঠিক মুকাম ভট্টা-
চার্যের মত। বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি যা কিছু লিখেছেন, তার মধ্যেই
আজ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের কবিরা মুষ্টিবদ্ধ হাতে উর্ধ্বে তুলে কবিতা লিখেছেন,
তাদের প্রতিজ্ঞায় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সোজার হয়ে উঠেছে। আল
মাহমুদের ভাষায়,

আমিও অন্তরঙ্গ হয়ে যাই হঠাৎ তখন
জনতার সমুদ্রের সাথে
বাঘের হাতের মত সন্থ শপথ
সোহাগের গাঢ় ইচ্ছা নিয়ে
নেমে আসে মনের উপর
নির্মম আদর পেয়ে আমিও রক্তাক্ত হবো
বরকতের শরীরের মত।

[অসহ সময় কাটে]

আবুবকর সিদ্দিক লিখেছেন,

সমস্ত বিচ্ছেদ ও বেদনার উপাশ্রে
আমি আসবো
হেঁটে হেঁটে রক্তাক্ত পায়ে
ছোবল ও তরঙ্গগুলো মাড়িয়ে
তোমার অনন্ত সান্নিধ্যে
আর
ডান হাতের মুঠোয় আমূল উপড়ে আনবো
আস্ত এক শপথের চারা
তোমার জন্য। **

[শপথের স্বর]

আনসার আলী লিখেছেন,

রক্তের শোধ রক্তে শুধবো মা গো
রক্তের শোধ সশস্ত্র সংগ্রাম

৩০ আবুবকর সিদ্দিক, খবল দুধের স্বরগ্রাম, পৃ: ৪৫-৪৬

সহস্র যুগে সূর্য সেনানা অসহ
অরণে তাদের উদাত্ত বাহু জাগো ।

[রক্ত দিলাম মাগো]

আহাদ মনসুরের প্রতিজ্ঞা,

এ আশ্রন নিভীক
দাউ দাউ জলছে জলবে
এ জীবন চায় আজ সংগ্রাম
দাসত্ব শৃঙ্খল ছিঁড়তে ।

[এ দৃশ্য আজকাল]

মাকিদ হারবারের শপথ,

আমার বংকালসার বুকে অসহ ব্যথা, আমি তবু শেষবারের
মত পড়ে যেতে যেতে বন্ধুদের জলন্ত বাতিটাকে
এই ক্ষীণকায় হাতের মুঠায়
ধরে রাখতে চাই ।

[স্বর্ণগ্রামে যাবো]

বাংলাদেশের কবিরা বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের যথার্থ সৈনিক ।
কবিতা উচ্চকণ্ঠে কোন শিল্প নয়, এবং মেহেতু বাস্তব অবস্থার কোন অবি-
কল ফোটোগ্রাফি তাতে পাওয়া যাবে না । কিন্তু বাঙালী জাতির মানস,
মনন, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের সুস্ব চৈতন্যসমূহের দলিল এসব
কবিতা । এই কবিতার মধ্যেই বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের ধারা-
বাহিকতা অবিকল থেকে গেছে ।

১
একুশে ফেব্রুয়ারী

একুশের গান
জসীম উদ্‌দীন

ঘুমাও ঘুমাও ভাইরা মোদের
ঘুমাও মাটির ঘরে,
তোমাদের কথা লিখিয়াছি মোরা
রক্তে আঁখর গড়ে ।

মাতা দিয়ে তার সন্তান বলি,
লিখেছে অমর সেই কথা কলি
ভাই দেছে ভাই বোঁ দেছে স্বামী,
যে রক্ত পথ পরে

ঘুমাও ঘুমাও ভাইরা মোদের
ঘুমাও মাটির ঘরে
মতিউর গেছে আসাদ গিয়াছে
জহিরুল গেছে আর,
রক্ত জ্বায় সাজায়েছে তারা
চরণ যে দেশ মার,
দিকে দিগন্তে প্রাণের জোয়ার,
ঘোষিছে স'বন। অন্ডায় আর
পেয়েছে জনতা গতি ছুঁবার
সে রাজ্য পথের পরে,

ঘুমাও ঘুমাও ভাইরা মোদের
ঘুমাও মাটির ঘরে ।

শহীদ মিনার
সুফিয়া কামাল

শহীদ মিনার আজও তার
শ্বেত শুভ্র বন্ধ অন্তরালে রেখেছে করিয়া লালে লাল
শোণিতাক্ত পঞ্জরে পঞ্জরে আজও রক্ত ঝরে,
আজও রমনার লালফুল অশোক শিমুল
রক্ত ঝরে পথের উপর ঝরে ঝর ঝর । ঝরা পাতায় উদাস
হাওয়ার কাঁদিয়া কাঁদিয়া বহে যায়
বহে দীর্ঘশ্বাস জননীর ।
মূকের ফুটেছে ভাষা, ভীক কণ্ঠে বেজে ওঠে গান
শহীদ মিনারে পেল মানুষ পথের সন্ধান ।

একুশে ফেব্রুয়ারী

আলাউদ্দীন আল আজাদ

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার ? ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো

চারকোটি পরিবার

খাড়া রয়েছি তো। যে-ভিত কখনো কোন রাজ্য

পারেনি ভাঙতে

হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার

থুরের ঝটিকা ধূলায় চূর্ণ যে-পদপ্রান্তে

যারা বুনি ধান

গুন টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাপর ঢালাই

সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্ত।

ইটের মিনার

ভেঙেছে ভাঙুক। ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী

চারকোটি পরিবার ॥

এ-কোন, মৃত্যু ? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,

শিহরে যাহার ওঠে না কান্না, ঝরে না অশ্রু ?

হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং

সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং

এ কোন, মৃত্যু ? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,

বিরহে যেখানে নেই হাহাকার ? কেবল সেতার

হয় প্রপাতের মহনীয় ধারা, অনেক কথার

পদাতিক ঋতু ? কলমে দেয় কবিতার কাল

ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা

চারকোটি কারিগর

বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণ লেখায় ।

পলাশের আর

রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়

দীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই

শহীদের নাম

এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে

তাই আমাদের

হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্যের মতো জলে শুধু এক

শপথের ভাস্কর ॥

একুশে ফেব্রুয়ারী
আবহুল গণি হাজারী

কাল রাতে উঠেছিল ঝড়।
আম জাম নিমের শাখায়
কাল রাতে এসেছিল
সত্যকার ঝড়।

কাল্পনের রৌদ্রতপ্ত ত্বনিত মাটিতে
সে ঝড় কাঁপন তুলেছিল,
দিয়েছিল কাজল চোখের হাতছানি।
অবোধ গাছের যত পাগল পাতারা
ক্ষেপে উঠেছিল।

ভেবেছিল, এই ঝড়
আনবে আনবে এক অমৃত ক্ষরণ
আনবে আনবে এক অরুণ জীবন ॥
আজ ভোরে উঠে দেখি
আকাশ গস্তীর,

গাছের পাতারা সব
স্তব্ধ হয়ে আকাশের গায়
স্তব্ধ-চিত্র এঁকে দিয়ে মেলে মেলে আছে
বিদ্যুতের তারে তারে অখণ্ড নিরাশা ॥
তবে বুঝি আসেনিকো ঝড়
তবে বুঝি এসেছিল শুধুই ইঙ্গিত
কিংবা শুধু এসেছিল সংকেতের সাড়া ॥
“না-না-না”

একুশের কবিতা

দিলওয়ার

এক

নদী ও বৃষ্টির জলে যে দেশে শস্তেরা অফুরান ।
দৈমাত্তক সেই দেশে সাহসী একুশে অনিবার্ণ

সূর্য বলে : এই দেশে একদা প্রলুপ্ত কিছু লোক ।
নারকী ক্ষমতা নিয়ে ভাগ্যের জুয়ায় যেতেছিলো,

এং যখন তারা চরম তৃষ্ণার মায়ালোকে
সহসা আপন মা-কে জুয়ার পেরেকে গঁথেছিলো ।

কুলাঙ্গার লোকগুলো লোলুপ ইচ্ছের বিষ ঢেলে
সেদিন বোষণা করে : আমরা হবোই ইন্ডিপাস
জননী উবশী হোক সোনার হরিণে ছাড়িবো না,
কলংক ছড়াবে কে নে ? আমরা রচিত ইতিহাস ।

অথচ বুঝনি তারা সেদিন মায়ের মেঠো ঘরে আগমন
সব্যসাচী শাণিত তীরের সূচীমুখে
লিখছিলো অবিরাম, বাক্য সে অমোঘ : প্রতিশোধ
ক্ষমা নেই ছঃশাসন, যদিও বিধাতা তোর বুকে ।

সূর্য বলে : তারপর একদা বিস্ময়ে দেখি আমি
আমার রশ্মিরা গ্লান কেমন স্তিমিত হয়ে গেছে
দেখি নিয়ে সমুদ্রত সংগ্রামী একুশে ফেব্রুয়ারী ।

সবাসাচী প্রতিজ্ঞায় রশ্মির শোণিত বয়ে গেছে ।
উজ্জ্বল বন্ধুত্বে আমি জড়িয়ে নিলাম তার বুকে
সে তখন লোকোত্তর : তিমির বিনাশী আছে স্মৃতি ।'
দ্বৈমাতৃক এই দেশে একুশে মায়ের অবিনাশ :
দিগন্ত বিস্তৃত পটে সার্থক সংগ্রামী অভিলାষ ।

SHAHIDUL MAZID MUNNA
72/B Malibagh Chowdhurypara
Dhaka-1219, Phone ; 414706

উনিশশো বাগ্নামোর একটি দিন

ফজল শাহাবুদ্দীন

কয়েকটি আত্মা চৌচির হয়ে পড়েছিলো

জন্ম নিয়েছিলো একটি দিন ;

আমি জানি না কী সে যন্ত্রণা

জানি না কেমন সে অনুভূতি

যার জ্বলন্ত অন্ধকার থেকে

বিদীর্ণ ধারালো সেই একটি দিন ।

ইতিহাসের খণ্ডিত ফুলিঙ্গের মতো একটি দিন

জন্ম নিলে ।

কেমন ক'রে জানি না চৌচির হোল কয়েকটি আত্মা

মহাকালের অন্ধকারকে যেমন জানি না

আবহমান কালের মৃত্যুকে

যেমন অনুভব করতে পারি না

তবু যা নিশ্চিত অনন্ত অস্থির—

তেমনি এই দিন

আমার চেতনায় আমার অস্তিত্বে

আমার রক্ত মাংসের শপথে

শব্দনিবাদিত ভয়ঙ্কর মৃত্যু আর অন্ধকারের মতো

উৎক্লিপ্ত উথাল পাথাল

যার থেকে জন্ম নেবে

আমার সেই অবিখ্যাত আনন্দ মূহিত ছিড়ে ছিড়ে যাওয়া

ভূমণ্ডল—

আমার সকল সত্ত্বার যার আকাঙ্ক্ষা

তেমনি পৃথিবী

জন্ম নেবে এই চৌচির ছিন্নভিন্ন সৌরভ থেকে

যন্ত্রণা থেকে অনুভূতি থেকে—

আমি জানিনা কী সে যন্ত্রণা

জানিনা কেমন সে অনুভূতি

যার

গোপন বিদীর্ণ উজ্জল উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা থেকে

জন্ম নেবে

আমার সম্পন্ন জ্যোতিষ্মান ভ্রমগুল

বিধ্বস্ত আত্মার সৌরভের উন্মথিত আলোছায়া থেকে

মুক্তির মতো স্বাধীনতার মতো প্রতিশোধের মতো

এই একটি দিন ।

একুশের গাথা

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ্‌

কখনো দাঁড়াই এসে অন্ধানত আমরা ক'জন
মিনারের পাদদেশে হাতে নিয়ে ফুলের অঞ্জলি
শব্দহীন স্তব্ধতায় হৃদয়ের প্রিয় কথা বলি
স্মৃতি ভারাতুর ক্ষণে থেমে যায় প্রাণের স্পন্দন
অতীত দিনের গাথা লেখে ক্লান্ত আমাদের মন
ছবি হয়ে ফোটে চোখে একুশের সেই দৃশ্যাবলী
রক্তিম ফাল্গুনে কবে একদা ঝরছে ফুলকলি—
ক'জন সাহসী যুবা। দেখি তাই আজো আগমন

মানুষের প্রিয়-স্মৃতি হয়ে আছে ভাস্বর অগ্নান
অশেষ মহিমায়, নয় শুধু শোক গাথা নয়
প্রোজ্জ্বল প্রতীকে জ্বলে মানসের সাহসী সঞ্চয়,
স্তব্ধতাকে দীর্ণ ক'রে বেজে ওঠে চিরঞ্জীব গান :
সবার প্রাণের ভাষা—মাতৃভাষা সত্তার সম্মানে
অগ্নান ঐশ্বর্যময় হয়ে রয় মৃত্যুঞ্জয়ী গান।

একুশে স্মরণে (১৯৭০)

কাইয়ুম চৌধুরী

সোনার কাঠি হারিয়ে গেছে
খুঁজে কোথায় পাব ?
রাজ্যি জুড়ে ঘুমের নেশা,
ঘুমেই মজে যাব ?
ঘুম ভাঙিয়ে কি হবে ছাই
স্বপ্ন দেখি জেগে
দিন আমাদের চলেই যাবে
পরের দোরে মেগে।

আমি একটি কাপুরুষ
আসাদ চৌধুরী

আমার ধমনীতে শোণিতে যে প্রবাহ
সেকি শুধু প্রহারেরই আমন্ত্রণ ?
নির্ধাতিত প্রাণ নিয়ে আমি কতকাল
প্রতিকারের প্রতীক্ষা করব, বল ।
প্রলাপের মত অকলঙ্ক কত কথা
বলেছি, শুনেছি, লিখেছি,
অরণ্যের ভ্রাণময়, কখনো বা ঝক ঝকে চক চকে,
শব্দের সঙ্গীতে কতবার আমি মূর্ছা গেছি ।
তবু বায়ান্ন সাল থেকে ওরা যা বলছে
আমি তার কিছুই বুঝিনি
ওদের রক্ত আমার রক্তের সাথে কথা বলতে চায়
আমি ভয়ে দেয়ালের দিকে পিছুই,
ওদের মুণ্ডহীন দেহ আলিঙ্গনের জন্য হাত বাড়ায়
আর আমি মায়ের পেছনে দাঁড়াই,
ওদের নিশ্বাসহীন কাফনময় অস্তিত্ব
আমি দৌড়ুই, পালাই,...
বায়ান্ন সাল থেকে আমিই শুধু চুপ করে আছি
কিন্তু ওরা ওদের কথা বলছেই ।
হে বায়ান্নর পদাতিক,
তোমাদের কথাকে কেউ হত্যা করতে পারবে না
তোমাদের দেহ থেকে নিপুণ জন্মাদ
একটি লোমও ফেলতে পারবে না ।

আমি আমার রক্তময় শরীর নিয়ে মৃত
সজীব জিভ নিয়ে বোবা,
লোভ লালসাময় প্রাণ নিয়ে ভোগের আশায়
আত্মাকে উলঙ্গ করি বিলায়ে দেই,
আমার রক্তে বাস করে অকৃতজ্ঞ শয়তান,
আমি ওদের ত্যাগকে নিয়ে
রাজনীতি করি ॥

SHAHIL UL MAZID MUNNA
72/B Malibagh Chowdharypara
Dhaka-1219, Phone : 414706

✓ আশ্চর্য জননী

নিয়ামত হোসেন

কি আশ্চর্য জননী আমার, চোখে জল নেই, মুখে নেই মলিনতা
তুমি কী ভীষণ লালে সজ্জিত হয়েছে। মনে তো আনন্দ নেই,
হৃদয় তরঙ্গে কই উচ্ছ্বসিত ঢেউ? কতো যে বসন্ত এলো—
সেজেছো তো বহুবর্ণ ফুলবাসে তুমি, লাল-নীল-পীত বর্ণ
ঝিকিমিকি রঙিন মেথলা, দেখেছি তোমার অঙ্গে কিন্তু এতো
তীব্র লাল বসন্তে পরো না তুমি। ফিরে এলো সেই সব
দিন? কোল জোড়া সোনার মাণিক দিল প্রাণ?
টকটকে লালরক্ত মাখা দেখি সন্তানের তোমার শাড়িতে।
আহত বাছাকে বুকে ধরে ছিলে? মাগো, মুখে বিষণ্ণতা কই।
চোখে বেদনার জল? তুমি তো গর্বেই হাসছো, সন্তানেরা
বার বার বুলেটের বিনিময়ে প্রাণ দেয় কচি কচি প্রাণ!
মাগো, ছঃখ নেই, কান্না নেই, বিন্দুমাত্র বেদনাও নেই
বরকতের, সালামের গর্বে তুমি ভীষণ গর্বিতা ॥

২

বাঙলাভাষা

বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা

শামসুর রহমান

নক্ষত্র পুঞ্জের মতো জ্বল জ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছে। আমার সন্তায়
মমতা নামের প্লুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড়
ঘিরে রয় সর্বদাই। কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে
শিউলি-শৈশবে 'পাখী সব করে রব' বলে মদন মোহন
তর্কালঙ্কার কী ধীরোদাত্ত স্বরে প্রত্যহ দিতো ডাক। তুমি আর

আমি, অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর মমতায় নীল,
ঘুরেছি কাননে তাঁর নেচে নেচে, যেখানে কুসুম-কলি সবই
ফোটে, জোটে অলি ঋতুর সংকেতে

আজন্ম আমার সাথী তুমি,

আমাকে স্বপ্নের সেতু দিয়েছিলে গ'ড়ে পলে পলে,
তাইতো ত্রিলোক আজ সুন্দর জাহাজ হয়ে ভেড়ে

আমারই বন্দরে।

গলিত কাচের যতো জলে ফাৎনা দেখে দেখে রঙিন মাছের
আশায় চিকন ছিপ ধ'রে গেছে বেলা। মনে পড়ে, কাঁচি দিয়ে
নজ্জা কাটা কাগজ এবং বোতলের ছিপি ফেলে
সেই কবে আমি 'হাসি খুশির' খেয়া বেয়ে

পৌঁছে গেছি রত্ন দ্বীপে কম্পাস বিহনে।

তুমি আসো, আমার ঘুমের বাগানেও

হে কোন্ বিশাল

গাছের কোটর থেকে লাফাতে লাফাতে নেমে আসো

আসো কাঠবিড়ালির রূপে,

কুল্ল মেঘমালা থেকে চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো ঐরাবত সেজে,

সুদূর পাঠশালার একানটি সতত সবুজ

মুখের মতোই ছলে ছলে ওঠে। তুমি
বারবার কিস্বা টুকটুকে লক্ষ্য-ঠেঁট টিয়ে হ'য়ে
কেমন ছলিয়ে দাও স্বপ্নময়তায় চৈতন্যের দাঁড়।

আমার এ অক্ষি গোলকের মধ্যে তুলি আঁখিতারা।

যুদ্ধের আগুনে,
মারীর তাণ্ডবে,
প্রবল বর্ষায়
কি অনাবৃষ্টিতে
বারবণিতার
নুপুর নিকণে,
বনিতার শান্ত
বাহুর বন্ধনে,
ঘৃণায় ধিকারে,
নৈরাজ্যের এলো
ধাবাড়ি চীৎকারে,
সৃষ্টির কাল্পনে

হে আমার আঁখিতারা তুমি উন্মীলিত সর্বক্ষণ জাগরণে।
তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার ?
উনিশ শো বাহান্নের দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছে। সর্গোরবে মহীয়সী।

সে ফুলের একটি পাপড়িও ছিল হ'লে আমার সত্তার দিকে।

কতো নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।

এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষমাস।

তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো,

বর্ণমালা, আমার হুঃখিনী বর্ণমালা।

বাংলাভাষা, মা আমার

ফজল শাহাবুদ্দিন

আমি একদিন দেখলাম অনেকগুলো পাখি

আমার চিরদিনের আকাংখার মতো

একরাশ নানারঙের ফুল হয়ে বাতাসে উড়ছে

ছপূরের রৌদ্রে সূর্যালোকে; বিষণ্ণ রাত্রিতে চন্দ্রিমার

সেই পাখির টুকরোগুলো

এক অবিশ্বাস্য আনন্দের ফুলিঙ্গ হয়ে

পৃথিবীর সকল সবুজ হলুদ লাল ধূসরতার মধ্যে

জীবনের অস্থির জ্যোতি ছড়িয়ে দিচ্ছে

হঠাৎ এই সনাতন চির পুরাতন বিশ্বচরাচর

আমার অস্তিত্বে

এ বিপুল বিস্তৃত উদ্দাম উজ্জলতায় ঝলে উঠলো

মনে হলো এই পাখির ফুলগুলো সূর্যালোকের পাপড়িগুলো

জ্যোৎস্নায় ভেজা গ'লে গ'লে পড়া মুহূর্তগুলো

আমার আত্মার অন্ধকারে আলোতে শূন্যতায়

অনন্তকাল এমনি ক'রে ঝরতে থাকবে উড়তে থাকবে খেলতে থাকবে

জীবনের বিস্ময়কর সূন্যতায় জ্যোতির্ময় হয়ে থাকবে

হে আমার বাংলাভাষা তোমার কাছে আমি

চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো।

তুমি না থাকলে আমার এই অভিজ্ঞতার কথা

আমি কোনোদিন কাউকে জানাতে পারতাম না।

আমি একদিন শুনলাম অনেক অনেক মানুষের কণ্ঠ

শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি

জল কল্লোলের মতো ঝড়ের শব্দের মতো সমুদ্র গর্জনের মতো

এশিয়ার ক্ষুধার্ত মাটিতে আফ্রিকার লুপ্তিত বনচ্ছায়ে

ল্যাটিন অমেরিকার শোষিত প্রান্তরে প্রান্তরে
ভিয়েতনামে এঙ্গেলায় মোজাম্বিকে
দক্ষিণ আফ্রিকার হীরক খনির হিংস্র অন্ধকারে
আর বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে নদীতে পাহাড়ে
শুনলাম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠ
গভীর বলিষ্ঠ তীক্ষ্ণ উদ্দীপিত এক বিপুল প্রত্যয়ে
মানুষের চিরদিনের সকল অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে
মেতে উঠেছে
স্বাধীনতার দিকে জীবনের দিকে আলোকের দিকে হাত বাড়িয়ে
মানুষ এক অবিশ্বাস্য ধ্বনিতে শপথ নিচ্ছে
জীবনের জন্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন কোরবার
মুক্তির জন্তে নিষ্ঠুরতাকে দীপ্ত করবার
সে কী উন্মাদনা মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে
জল কল্লোলের মতো ঝড়ের শব্দের মতো সমুদ্র গর্জনের মতো
হে বাংলাভাষা আমার, আমি চিরকাল তোমার কাছে
কৃতজ্ঞ থাকবো
তুমি না হলে মানুষের এই উজ্জীবিত অভ্যুত্থানের কথা
আমি কোনদিন উচ্চারণ করতে পারতাম না
অমি একদিন দেখলাম বাংলাদেশের আকাশ ছেয়ে বৃষ্টি নাবলো
শ্রাবণের অন্ধকার থেকে আষাঢ়ের মোহাবিষ্ট অপরাহ্ন থেকে
রবীন্দ্র সঙ্গীতের মতো বৃষ্টির অজস্র সঘন গহন ধ্বনি
উন্মথিত উচ্ছ্বসিত আনন্দে আবেগে মর্মরিত
ছড়িয়ে পড়লো
পদ্মা মেঘনা তিতাসের হাওয়ার মতো উদাস করা
বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের অন্ধকারে, রক্ত কণিকায়
নাঝির হৃকো থেকে পরিচ্ছন্ন নিঃশ্বাসে
কৃষকের বলিষ্ঠ হাত থেকে লাঙলের ফলায় ফলায়

পল্লীবধুর স্বপ্নাঞ্জন মাথা দৃষ্টি থেকে
 লেবুতলায় করমচা বনে লাউয়ের মাথায়
 ছড়িয়ে পড়লো
 রবীন্দ্র সঙ্গীতের মতো শ্রাবণের ধারা আষাঢ়ের ধ্বনি
 বিশাল অস্থির গুরু নিবিড় তিমির
 বাংলাদেশের চিত্র নেচে উঠলো ময়ূরের মতো শতবর্ণের উচ্ছ্বাসে
 আমাদের ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কর্মে কোলাহলে ক্লান্তিতে আকাজক্ষায়
 সেই অনাদিকালের বৃষ্টি নতুন গানে গানে উন্মাদ হোল
 আমি একদিন দেখলাম বাংলাদেশের আকাশ ছেয়ে বৃষ্টি নাবলো
 হে আমার আত্মার ভাষা, বাংলা আমার
 তোমার কাছে আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো
 তুমি না থাকলে মায়ের মতো প্রকৃতির এই অলৌকিক
 উন্মত্ততার কথা
 আমি কোনদিন লিপিবদ্ধ করতে পারতাম না
 আমি একদিন অকস্মাৎ অনুভব করলাম
 আমার হৃদয়ে এক অজানা অচেনা বিষ্ময়কর নদী
 ছল ছল ক'রে উঠলো
 গোপন ভালোবাসার মতো ফুল ফোটার রহস্যময় মুহূর্তের মতো
 যখন স্পর্শের থর থর ক'রে কেঁপে ওঠা অভিজ্ঞতার মতো
 এই নদী আমার অন্ধকারে
 শুধু কল্লোলিত হতে থাকলো নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে মুখর হতে থাকলো
 আর ছড়িয়ে দিতে থাকলো আমার সন্তায়
 এক অলৌকিক অচিন্ত্যনীয় বধির ইচ্ছের আগুন
 আমার ইচ্ছে হোল নক্ষত্রলোকের রূপসী জ্যোতিকণাকে
 ছুঁতে লুট ক'রে এনে ছড়িয়ে দিই তোমার শরীরে
 ইচ্ছে হোল, আমার আদিম কুৎসিত বাসনায় উচ্ছ্বলতাকে
 চিরদিনের অবিনশ্বর সুস্থতায় অসংকোচে ছড়িয়ে দিই

তোমাদের আনন্দে আর সৌন্দর্য চেতনায়
 ইচ্ছে হোল পৃথিবীটাকে একটা কমলালেবুর মতো
 একটা সম্পন্ন ফলের মতো এক টুকরো তাজা মাংসের মতো
 আমার হাতের মুঠোয় নিয়ে খেলা করি
 আমার ভেতরের সেই ছল ছল করা নদী
 আমাকে এক শাণিত উজ্জীবিত পুরুষে রূপান্তরিত করলো
 আমি ঈশ্বরের মতো এক স্বয়ম্ভু অস্তিত্বে
 নতুন করে বেঁচে উঠলাম
 আমার মধ্যে চিরকালের সেই শব্দের অনুভবের অস্থিরতার পৃথিবী
 প্রকাশিত হওয়ার যন্ত্রণায়
 হাজার হাজার পাখির মতো এক সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলো
 হে আমার বাংলাভাষা মা আমার
 তোমার কাছে আমি আমৃত্যু অনন্তকাল কৃতজ্ঞ থাকবো
 তুমি না থাকলে আমার এই রহস্যময় নদীর কথা স্বয়ম্ভু যন্ত্রণার কথা
 আমি কোনদিন পৃথিবীর কাছে রেখে যেতে পারতাম না
 আমি একদিন দেখলাম এদেশের হাজার হাজার তরুণ
 উৎক্লিষ্ট ফুলিঙ্গের মতো পথে পথে নেবে এসেছে
 ছপুয়ের রৌদ্রোজ্জ্বল পীচ ঢালা পথে সেই তারুণ্যের সমুদ্রে
 আমিও মিশে গেলাম সেদিন
 আমরা সবাই মিশে গেলাম
 মাগো, সেই সমুদ্রের তরঙ্গে
 তোমার মুখের ভাষাকে বাঁচাবো বলে,
 রমনার কৃষ্ণচূড়ার লাল পথ
 প্রথম ফাল্গুনের উষ্ণ বাতাসে ছাওয়া আকাশ
 তোমার জয়ধ্বনিতে মুখর হোল
 বরকত সালাম রফিক নিজের তাজা রক্তে তোমার ঋণ
 শোধ ক'রে গেলো
 হে আমার বাংলাভাষা, মা আমার

বাংলা ভাষার প্রতি
মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ

তোমার প্রতিটি শব্দ ছন্দ-ধ্বনি-লয়
আমার চৈতন্যে আছে, আছে মনোময়
অস্তিত্বের উচ্চারিত প্রতি প্রহরে
আমার আকাঙ্ক্ষা দীপ্ত তোমার অক্ষরে !
প্রেমের সংলাপে আর মৃত্যুঞ্জয়ী গানে
সংঘবদ্ধ আন্দোলনে মিছিলে জ্ঞানগানে
তোমার প্রতিটি শব্দ দেখি রাজপথে
অনির্বাক হয়ে জ্বলে উজ্জ্বল শপথে ।

মাতৃ ভাষা

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ

ধ্বনির সম্পদ আছে আমাদের সত্তার গভীরে
অশেষ ঐশ্বর্যময় রূপে ও রেখায় মনোহর
যে-ধ্বনিতে দীপ্ত হয় চিরচেনা প্রিয় কণ্ঠস্বর
চেতনার আলো হয়ে জ্বলে ওঠে বিষণ্ণ তিমিরে
প্রাণের ভাষায় আর সঙ্গীতের অলৌকিক মীড়ে
জেগে থাকে সারা মন সুখ-দুঃখ বিমর্ষ প্রহরে
উৎসবে আনন্দে ফুল্ল স্বপ্ন-ধন হৃদয়ের ঘরে
ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা হয় ধ্বনিপুঞ্জ দীর্ঘ-কণ্ঠ চিরে।

এবং প্রাণের ভাষা আশা ও আশ্বাসে অনিবার
দোল খায়, শিল্পময় চেতনার সজাগ প্রহরী
দুঃখের দারুণ দিন কিংবা কোন বিদায় শব্দরী
যখন জীবনে আসে, আসে দিন ক্লান্তি হতাশার।
তখন প্রাণের ভাষা মাতৃ-ভাষা স্বপ্ন আনে মনে
সংগ্রামী প্রেরণা আনে চিরঞ্জীব সত্তার গহনে

৩
বাংলাদেশ

আমার পূর্ববাংলা

সৈয়দ আলী আহসান

আমার পূর্ববাংলা

আমার পূর্ববাংলা অনেক রাতে গাছের

পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো

কখনও মৃদঙ্গ, হঠাৎ কখনও বেহালা—

এক সময় বাঁশির সুর

যখন রাতে একাকী ঘুম ভাঙে

অনবরত কোমল কোলাহলে

স্বপ্নের মতো পাতায় পাতায়

শব্দকে দেখি

তার আকুল বিকাশ

অন্ধকার আকাশের চেতনার মতো

যে চেতনা এক সময় অতল অবলুপ্তি

এক সময় কালো চোখের তন্দ্রা

এক সময় হঠাৎ জাগরিত বস্তু

কিন্তু চিরকাল অনেক গন্ধ, শব্দ এবং

চোখ-চেয়ে দেখার কথায়

ভরপুর

আমার পূর্ববাংলা অনেক রাতে বৃষ্টির শব্দের মতো

স্বচ্ছ নির্মল গাছের পাতায় মুক্তা

ছোট ছোট ফুল যেন অনেক তারা

যেন বন কন্যাদের চোখের পানি

যেন নিটোল নখের ওপর শুভ্রির স্বচ্ছতা

এগুলো সব অনুভবে আসে
অনেক রাতে বৃষ্টির শব্দ জাগে
আমার চেতনার ধনধান্য
এবং অন্ধকারের প্রদীপ
বৃষ্টি বৃষ্টি এখানে সেখানে

পৃথিবীর সর্বত্র
শিকাগো শহরে নিউইয়র্কে প্যারিসে
কোথাও আলো ছুঁয়ে, কোথাও
জানালার কাছে
কোথাও মস্তুর ঐশ্বর্যের গাড়ি, বর্ষাতি, ছাতা—
আমার পৃথিবীর বৃষ্টি—মাটির
গন্ধ, ধানক্ষেত ভেসে যাওয়া
আমগাছের ডাল ভেঙে পড়া
হঠাৎ গরুর ডাক, ভিজ-যাওয়া

পাখির ডানা ঝাপটানো
আবার পুকুরে, নদীতে
ডোবায় লাবণ্যের সাড়া
আমার পূর্ববাংলা অনেক রাতে
গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো ॥

আমার পূর্ববাংলা এক গুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ
সন্ধ্যার উন্মেষের মতো
সরোবরের অতলের মতো
কালো-কেশ মেঘের সঞ্চয়ের মতো

বিমুক্ত বেদনার শান্তি
আমার পূর্ববাংলা বর্ষার অন্ধকারের অনুরাগ
হৃদয় ছুঁয়ে-যাওয়া

সিন্ধু নীলাম্বরী।

নিকুঞ্জের তমাল কনক-লতায় ঘেরা
কবরী এলো করে আকাশ দেখার

মুহূর্ত

অশেষ অনুভা নিয়ে

পুলকিত সচ্ছলতা

এক সময় সূর্যকে ঢেকে

অনেক মেঘের পালক

রাশি রাশি ধান মাটি আর পানির

কেমন নিশ্চেতন-করা গন্ধ

কত দশা বিরহিণীর—এক দুই তিন

দশটি

এখানে ব্রহ্ম আকুলতায় চিরকাল

অভিসার

ঘর আর বিদেশ আঙিনা

আকুলতায় একাকার

তিনটি ফুল আর অনেক পাতা নিয়ে

কদম তরুর একটি শাখা মাটি ছুঁয়েছে

আরও অনেক গাছ পাতা লতা

নীল হলুদ বেগুনি অথবা শাদা

অজস্র ফুলের বন্যা অফুরন্ত

ঘুমের অলসতায় চোখ বুজে আসার মতো শান্তি।

কাকের চোখের মতো কালো চুল

এলিয়ে

পানিতে পা ডুবিয়ে—রাঙা উৎপল

যার উপমা

হৃদয় ছুঁয়ে-যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরীতে

দেহ ঘিরে

যে দেহের উপমা স্নিগ্ধ তমাল—

তুমি আমার পূর্ববাংলা

পুলকিত সচ্ছলতায় প্রগাঢ় নিকুঞ্জ ।

পূর্ববাংলা—এক
সানাউল হক

অবশিষ্ট সময়ের বালিশে শিথান মগ্নতায়
ছড়ানো কেশের রাত্রি, স্ননির্জন হয়তো ছপুর,
অজস্র নদীর আশি, দুই তীরে বিঁবিঁর ঘুঙুর,
মনে হয় পাশ দিই : অথ কোনো স্র ভগ্নতায়
ছপদাপ যদি এসে জানালায় দেয় কেউ টোকা ;
অতীতের আত্মদানে জন্ম নেয় রক্তের শিশুরা ।
মাতৃস্নুলভ স্বপ্ন নেশা ঘোরে অত্নতর ধোকা
প্রাবণী ডাগর তনু মুখোমুখি অনন্যা অনুচা ।
কী গান শোনাও তুমি—মাদুলিক অভিজ্ঞান
জয়-পরাজয়-উর্ধ্ব, (ধরিত্রীর প্রান্তিক দুহিতা)
কর্মে অর্মে প্রফুটনে রক্তক্ষয়ে, ওগো গুচিস্মিতা ?
করতোয়া শঙ্খ নদী কুলু ধ্বনি : কী আনন্দ স্নান ।
পাত্র মিত্র সভাসদ লুপ্ত হোক ; তুমি কি ঈপ্সিতা
ছিন্ন ভিন্ন ছেঁড়া তন্ত্রী সম্পূর্ণ সহাস এক গান ?

পূর্ববাংলা-দুই

সানাউল হক

অতিথি বৎসলা, স্পর্শাতুর

আষাঢ়শ্র মেঘ,

হয়তো বা গহন কাজল

দীঘি, নিরুদ্বেগ।

কথার আগেই চোখে পানি

ছোবলে বেহুলা,

ভেলায় ভাসিয়ে দিয়ে আশা

তরঙ্গ মৃদুলা।

নরম পলিতে কত কেউ হাঁটে

চিত্রকল্প তার

পাঁজরে চিহ্নিত বড়ঝতু

কণ্ঠ অনুচ্চার।

লোভী কেউ এসে যদি মুছে দেয়

চোখের কাজল

বিষম কাতর মুখ, ভেজা চোখে

বিস্রত আঁচল।

মৈত্রেয়ী সৌভ্রাত্যে মগ্না

বিপাকে নিঃসাড়

অধোগতি চেতনার ঢেউ

স্বস্বপ্ত জোয়ার।

পূর্ববাংলা, মৌন সমর্পিতা

শাস্ত্রী প্রতীক্ষা

কী পাবে পাবে না, উদাসীনা

ধরিত্রী তিতিক্ষা।

আমার দুঃখিনী বাংলা
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

আমার দুঃখিনী বাংলা
মা, তুই আমার জননী
তোর ঐ আকাশে চাঁদ
আর দিনে হাসে দিনমণি।
তবু তোর চোখে কেন অশ্রুভরা জল
মা তুই অহল্যা হলি
কার শাপে বল ?

আমার দুঃখিনী বাংলা
মা তোর এত শ্যামলিমা
মা তোর স্তন্যপায়ী
দেহে তোরই সুখা অরুণিমা
মা তোর চেখের জলে
কেন নদী উৎরোল
মা তুই অহল্যা হলি
কার শাপে বল ?

তুই অন্নপূর্ণা জানি
আজ একি অভিশপ্ত থরা
মা তোর সোনার ধানে
সিন্ধু পারে কার ভাণ্ডভরা
তোর ছেলে উপবাসী
কন্তা তোর কলঙ্কিনী সীতা

যা ছিল সৃষ্টির পাত্রে
প্রজ্ঞাপারমিতা

সবই তো লুপ্তিত মাগো
বল তুই বল
তোর এই অহল্যা মূর্তি
কার শাপে বল ?

আমার বাংলা
কায়স্থল হক

এক

বাংলা, তোমার মাঠজুড়ে শুয়ে থাকে
চাঁদের অমল আলো যখন, তখন
পরীদের দেশে মন চলে যায়। আর সাত পাকে
বাঁধে জীবনকে আশীর্বাদের মতন।

দুই

সজনে ডাঁটার গন্ধ
মাছের চচ্চড়ি
সব কিছু মিলিয়ে আমার
আ মরি সোনার বাংলাকে আমি দেখি।
প্লাবনে অথবা সাইক্লোনে
অবিরাম লড়ে যে বাংলা,
নারিকেল সুপারির অন্তরঙ্গতায়
আম জাম কাঁঠালের কলার বাগানে
অথবা কলমি শাক-ভরা পুকুরের
টলটলে জলে যে বাংলা
তাকে আমি রোজ দেখি।
আ-মরি সোনার বাংলা তোমায় আমি ভালোবাসি—

নিদ্রিতা মায়ের নাম

আল মাহমুদ

তাড়িত ছুঃখের চতুর্দিকে স্মৃতির মিছিল
রক্তাক্ত বন্ধুদের মুখ উত্তেজিত হাতের টঙ্কারে
তীরের ফলার মত

নিষ্কিপ্ত ভাষার চীৎকার

বাঙলা, বাঙলা

কে নিদ্রামগ্ন আমার মায়ের নাম উচ্চারণ করো ?

জানালায় মুখ রেখে চকিতে দেখলাম
উদয়ের প্রান্তদেশে ভেসে উঠে কালের কহলার
আর সমস্ত রাজপথে ফেত্রারীর নিঃশব্দ পাখির আওয়াজ
রক্তাক্ত ফুলের মত আমার সঙ্গীতজ্ঞ ভাইদের মুখাবয়ব

বাঙলা...বাঙলা...

আমার নিদ্রিতা মায়ের নাম ইতস্ততঃ উচ্চারিত হলো ।

স্বদেশের নাম
(সন্দীপন গোপ্পীর জন্তে)
আবুবকর সিদ্দিক

তরঙ্গ তোমার নামে নদীতে স্বদেশ !
নীলিমা তোমার নামে আকাশে স্বদেশ !
তুমি এক সম্মোহন অনিবার—
প্রত্যয়ের মূলে ।

আমায় রক্তের দাগে তবে লেখা থাক
শপথ তোমার নামে দেশ !
মরণ ও মরণের চেয়ে আরো কিছু
লিখে রেখে যাই এই
সীমান্তের দ্রৈক্ষে ।

স্বদেশের নদনদী আমাদের ধমনীতে বয় ।
স্বদেশের নীলাকাশে আমাদের শেষ নিঃশ্বাস ।
আমাদের ভালবাসা বিত্ত,
উর্বর মাটিতে গান
ফসলের,
মানুষের অমোঘ উদ্বেষ ।

স্বদেশের ছবি

হাসানামামুদ

মোড় পেরুলেই দেখি
চেনা ঘর চেনা মাঠ বিদেশ বিভূঁই
হয়ে গেছে। চৈত্রী বাতাসে
ধুলো ও রাস্তায় হয়তো বা
বুড়ো বট হাওয়ায় হাওয়ায়
বিভীষিকা হাঁক দেয় কালবৈশাখে।
কানাই জলার মাঠে এখনো শালুক
অথবা চড়ুই ভাতি উৎসব বালকের,
হাওয়ায় হেনার গন্ধ
বুকে মাখা
মায়ের বাপের দেশ, প্রপিতামহেরও...
যৌবন আনন্দে কাঁপা, মরণ
মাটির ভ্রাণে
কল্যাণে।
এখানে
বটের ছায়াও নেই, বাবলার কাঁটা
কখনো বেঁধে না পায়। প্রিয় সখীজন
উধাও জীবন থেকে
রায়েলের পাড়
স্বপ্নতোয়া জলে রেলিঙের ছবি
দোলে
কালো বাড়ির বাঁশি গান গায়

ছইয়ের গাড়িতে কাঁপে সন্ধ্যার বৈভব
এখানে,
কিছুই তো মেলে না এখানে ,

বাবলার কাঁটাও বেঁধে না
প্রিয় সখীজনও পলাতক,
বিদেশ-বিভূঁয়ে বসে
হৃদয়েই স্বদেশ দেখি :
বাপের মায়ের দেশ, প্রপিতামহীরও ।

মাতৃভূমি তোমার দীন রক্তকে
অনজুরে মাওলা।

চিন্তার সম্পন্ন রঙ পালটে পালটে কালো হয়ে যায়
নৈঃশব্দকে মনে হয় জলোচ্ছ্বাসের প্রবল আর্তনাদ
শব্দকে তিমির বিলীন অন্তহীন সিঁড়ি
হে শিল্প হে সভ্যতা
তোমার হৃৎপিণ্ডের রক্তে তখন আমি স্নাত হতে চাই
লুকিয়ে থাকতে চাই তোমার দীর্ঘ চুলের আড়ালে
আর আমাকেও তুমি
বৈজ্ঞানিকের নতুন জানা বিশ্বের নত
করতলে বিধৃত করতে চাও,
সময়ে লালিত
মাতৃভূমি
তোমার দীন রক্তকে আমি দীনতম করি নি
পদ চারণার চিহ্ন ছাড়া ক্ষত দিই নি কিছু
তবু কেন শাস্তি দাও
পুড়িয়ে ফেলে সভ্যতার দীর্ঘ চুলের রশ্মি
আর্দ্র করে হৃৎপিণ্ডের নরম মাটি দেয়াল
শূন্য হাতে গুঁজে দিয়ে ক্রেদান্ত ধ্বনি
কী আনন্দ পাও তুমি, কী আনন্দ
নক্ষত্রের শীতল স্পর্শ পিঠে
আমি আর বইতে পারি না।

নবান্ন : ১৩৭৬

ফজল শাহাবুদ্দিন

এখন ফসল নেই বাংলাদেশে । হাওয়ায় ওঠে না
তুলে রাশি রাশি তৃপ্তির শিখার মতো

স্বর্ণরঙ শস্যকণা আর

খামারেতে নেই নেই আকাজক্ষার সম্পন্ন শরীর

এবং ইদানীং

ক্ষুধার পতাকা এক উড়ছে শুধুই

বিরাত আকাশ জুড়ে আশ্বিনের সুনীল ললাটে

বাংলাদেশে আসেনা অজ্ঞাণ

কিংবা পৌষ পার্বণের পালনা নাচের মুদ্রায়

কাঁপা কাঁপা হয় না অস্থির

ঘরের নিবিড় উষ্ণতায় কালো চোখে

ইচ্ছের আবর্তে খুনের ঐশ্বর্যে

অথবা দূরের ধানকাটা প্রান্তরের পার

শীতাত হাওয়ায়

এখন ফসল নেই বাংলাদেশে

অথচ তোমরা

কি করে মেতেছো বলো

প্রাচীন বিশাল সেই নবান্নের মাতাল উৎসবে ।

আমার বাংলা
ফজল শাহাবুদ্দিন

আমার বাংলার এই নদী মাঠ পাহাড় প্রান্তর
জানিনা কেমন ক'রে মিশে আছে রক্তকণিকার
আত্মার গভীর শুনি কল্লোলিত সকাল সন্ধ্যায়
পদ্মার বিশাল ব্যাপ্তি ছরন্ত সে সমুদ্রের গান

নিজকে যদিও চাই ছড়াতে যে এই পৃথিবীতে
দূরের প্রকৃতি আর দূর দেশে আছে যত গান
আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে প্রতিদিন ক'রে যাই পান—
তবুও হৃদয় শুধু মগ্ন থাকে বাংলার ধ্বনিতে ।

পৃথিবী অজানা আর বাংলাদেশ রক্তে ধ্বনিময়
যেখানেই যাই দেখি এই দেশ চলে সঙ্গে সঙ্গে
অচেনা সমুদ্রে কাঁপে বঙ্গভূমি তরঙ্গে তরঙ্গে—
তৃষ্ণার্ত স্বদেশ তুমি কেন ডাকো সকল সময় ।

মায়ের ভাষার মতো উন্মথিত এখ মাঠ নদী
গভীর ঘনিষ্ঠ জানি রক্তলোকে কাঁপে নিরবধি ।

বাংলা আমার স্বপ্ন আমার
ফজল শাহাবুদ্দীন

হাওয়ায় হাওয়ায় কারা কথা বলে কী যে শুধায়
বাংলাদেশের মানুষেরা সব গেলো কোথায় ?

মিছিলে মিছিলে দেখি কতো মুখ কতো যে হাত
অধীর বধির শপথে কঠিন শহরে গ্রামে
বুকের রুধির দিয়েছে যে ঢেলে দেশের নামে—
তবুও কেন যে বাংলাদেশের কাটেনা রাত !

বাজারে গঞ্জে নদীতে পাহাড়ে উঠেছে বাড়
বাংলা আমার স্বপ্ন আমার আমার গান
মায়ের ভাষায় মূর্ত পৃথিবী আমার প্রাণ—
তবুও কেন যে পায়নাকো ভাষা অযুত স্বর !

হাওয়ায় হাওয়ায় মুখরিত কারা কী যে শুধায় !
বাংলাদেশের মানুষেরা সব গেলো কোথায় ?

আমার মায়ের অশ্রু ঘুচাবে এমন কেউ
হাজার হাজার লক্ষ কোটিতে বিরামহীন
আত্মবলিতে চেয়েছে বাঁচার নতুন দিন—
তবুও আকাশে নেই কেন সেই পাখির ঢেউ ?

আমার মায়ের কণ্ঠ ঘিরে যে করে আঘাত
এরা কারা বলো কথা বলে এরা কোন ভাষায়
মায়ের রক্ত শুষে শুষে এরা কী সুখ পায় ?
জানে না একদা এদের খুনেই হবে প্রপাত ।

হাওয়ায় হাওয়ায় কারা কেঁদে ফেরে কী যে শুধায়
বাংলাদেশের মানুষেরা সব গেলো কোথায় ?

শুনেছি একদা প্রসারিত মাঠে ছিলো ফসল
সকল সন্ধ্যা পুষ্পিত সেই বাংলাদেশে—
এখন কুষ্কার অজগর নাচে যেখানে এসে ;
কে মোছাবে বলো আমার দেশের চোখের জল ?

আমরা সবাই প্রাণের চেয়েও বাসি যে ভালো
বাংলাদেশের নদী প্রান্তর আকাশ নীল
দোয়েল কোয়েল ফিঙে হরিয়াল পাহাড় ঝিল—
সবখানে যেথা একই ধ্বনি শুনি 'রক্ত ঢালো' ।

হাওয়ায় হাওয়ায় কারা কথা বলে কী যে শুধায়
বাংলাদেশের মানুষেরা সব গেলো কোথায় ?

এ দেশ আমার স্বর্গ
আহমদ রফিক

‘এ দেশ আমার স্বর্গ—বার বার কত না শুনেছি
মিছিলের দীপ্তমুখে বজ্রমুষ্টি ঘোষণা তুলেছি ;
রক্তত বাঘিনী গ্রাসে অপজাত অরণি সাধনা—
বণিকী উল্লাস কাড়ে কুমারীর বিগুহ বাসনা,
ধনিক বণিকে মিলে নরকের গৃধ্রু বাঁটোয়ারা
নিমজ্জিত বুদ্ধিজীবী, হাসে নগ্ন ফ্যাশান কথারা ।

এখন স্বর্গের সিঁড়ি ঠিকেদারী কালো রাজনীতি
উত্তর ঢাকায় বাড়ী আয়েশের মনোরম ফীতি
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত । কবি শিল্পী বুদ্ধিজীবী মিলে
অনুকূল শ্রোতোমুখী বৃহত্তর আশু প্রয়োজনে !
অসুস্থ দিনের সাথে আড়ি দিয়ে পানীয় টেবিলে
পরিমিত কৃষ্টি চর্চা স্বাস্থ্য ভোজ্য স্মৃতি রোমন্থনে ।

আপন ছলনা তবু চেতনার নিভৃত গ্রহরে
ভুলের মাশুল গুণে নিয়ে যায় পরিচিত ভীড়ে :
অন্ধকারে শবাধারে স্নিগ্ধ শ্বেত বিশ্বস্ত চাদরে
আবৃত মুখের ছবি ; স্মৃতি দন্ধ যন্ত্রণার তীরে
সাজানো উদ্ভান ঘর আত্মরতি লোক সফলতা
মূহূর্ত-গ্লানির ভারে লবণাক্ত ; প্রকট শূন্যতা ।

আমরা মুখোস-আঁটা ভীত রুগ্ন বিনষ্ট আত্মা
মিলেছি সবাই এক স্বর্ণতীরে বধির বিন্দুতে ।

বাংলার কারবালা .

হুমায়ুন কবির

কারবালা হয়ে যায় সমস্ত বাংলাদেশ, হায় !

কারবালা হয়ে যায় !

নিষ্পত্ত সমস্ত বৃক্ষ, তৃণহীন প্রান্তর হাহা করে,

জল নেই, জল নেই, কান্না ফাটা শিশুদের গ্রীবা

চতুর্দিকে ঝলকায় কৃতান্ত সীমার,

ভীষণ খঞ্জর তার বিদ্ধ করে এই বাংলার

আমাকে অত্মকে ; আর জননীকে

ভীষণ যন্ত্রণা দেয়, দুঃখ দেয় শুধু ।

আমি কি পারি না বলো, হানিফার মতো দীপ্ত হয়ে

তীব্র অশ্বে আরুঢ় বানবানা, ভেঙে ফেলি লোভের প্রাচীর,

বাংলার রিক্ত মাটি সিক্ত করি দূরের নহরে

সিক্ত করি শুষ্ক কণ্ঠ হিংস্রতার বুকের রুধিরে ॥

৪

৯৩

উনসত্তরের বাংলাদেশ

ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯

শামসুর রাহমান

এখানে এসেছি কেন ? এখানে কী কাজ আমাদের ?
এখানে তো বোনাস ভাউচারের খেলা নেই কিম্বা নেই মায়া
কোন গোল টেবিলের; শাসনতন্ত্রের ভেলকিবাজি,
সিনেমার রঙিন টিকিট
নেই, নেই সার্কাসের নিরীহ অসুস্থ বাঘ, কসরৎ দেখানো
তরুণীর শরীরের ঝলকানি নেই কিম্বা ফানুস ওড়ানো
তা-ও নেই, তবু কেন এখানে জমাই ভিড় আমরা সবাই ?

আমি দূর পলাশতলীর
হাড়িসার ক্লান্ত এক ফতুর কৃষক
মধ্যযুগী-বিবর্ণ পটের মতো ধু-ধু,
আমি মেঘনার মাঝি, ঝড়-বাদলের নিত্য সহচর,
আমি চটকলের শ্রমিক,
আমি মৃত রমাকান্ত কামারের নয়ন পুত্তলি,
আমি মাটি লেপা উঠানের
উদাস কুমোর, প্রায় ক্ষ্যাপা, গ্রাম উজাড়ের সাক্ষী,
আমি তাঁতী সঙ্গীহীন, কখনো পড়িনি ফার্সি ;বুনেছি কাপড় মোটা-মিহি
মিশিয়ে মৈত্রীর ধ্যান তাতে,
আমি, রাজস্ব দফতরের করুণ কেরানী, মাছি-মারা, তাড়া-খাওয়া
আমি ছাত্র, উজ্জ্বল তরুণ,
আমি নব্যকালের লেখক,
আমার হৃদয়ে চর্যাপদের হরিণী

নিত্য করে আসা-যাওয়া, আমার মননে
রাবীন্দ্রিক ধ্যান জাগে নতুন বিজ্ঞাসে
এবং মেলাই তাকে বাস্তবের তুমুল রোদদুরে
আর চৈতন্যের নীলে কতো স্বপ্ন-হাঁস ভাসে নাক্তরিক স্পন্দনে সর্বদা।

২

আমরা সবাই
এখানে এসেছি কেন ? এখানে কী কাজ আমাদের ?
কোন সে জোয়ার
করেছে নিক্ষেপ আমাদের এখন এখানে এই
ফাল্গুনের রোদে ? বুঝি জীবনেরই ডাকে
বাহিরকে আমরা করেছি ঘর, ঘরকে বাহির।
জীবন মানেই
মাথলা মাথায় মাঠে ঝাঁঝ ঝাঁঝ রোদে লাঙ্গল চালানো,
জীবন মানেই ফসলের গুচ্ছ বুকে নিবিড় জড়ানো
জীবন মানেই
মেঘনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দাঁড় বাওয়া আর পাল খাটানো হাওয়ায়,
জীবন মানেই
পৌষের শীতাত্ত রাতে আগুন পোহানো নিরিবিলা
জীবন মানেই
মুখ থেকে কারখানার কালি মুছে বাড়ি ফেরা এক শিশ দিয়ে,
জীবন মানেই
টেপির মায়ের জন্তে হাট থেকে ডুরে শাড়ি কেনা,
জীবন মানেই
বইয়ের পাতায় মগ্ন হওয়া, সহপাঠিনীর চুলে
অন্তরঙ্গ আলো তরঙ্গের খেলা দেখা,

জীবন মানেই

তালে তালে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে মিছিলে চলা, নিশান ওড়ানো,
অত্মায়ের প্রতিবাদে শূন্যে মুঠি তোলা,

জীবন মানেই

মায়ের প্রসন্ন কোলে মাথা শৈশবের নানা কথা ভাবা,

জীবন মানেই

খুকির নতুন ফ্রকে নকশা তোলা, চারু লেস বোনা,

জীবন মানেই—

ভায়ের মুখের হাসি, বোনের নিপুণ চুল আচড়ানো

প্রিয়ার খোঁপায় ফুল গোঁজা ;

জীবন মানেই

হাসপাতালের বেডে শুয়ে একা আরোগ্য ভাবনা,

জীবন মানেই

গলির মোড়ের কলে মুখ দিয়ে চুমুকে চুমুকে জলপান,

৩

জীবন মানেই

রেশনের দোকানের লাইনে দাঁড়ানো,

জীবন মানেই

ফুলিঙ্গের মতো সব ইস্তাহার বিলি করা আনাচে কানাচে

জীবন মানেই—

আবার ফুটেছে ছাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে

কেমন নিবিড় হ'য়ে । কখনও মিছিলে কখনো বা

একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয় ফুল নয়, ওরা

শহীদের বালকিত রক্তের বুদ্ধদ, স্মৃতি গন্ধে ভরপুর

একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ ।

এ রঙের বিপরীত আছে অন্য রঙ,
যে-রঙ লাগে না ভালো চোখে, যে-রঙ সস্ত্রাস আনে
প্রাত্যহিকতায় আমাদের মনে সকাল সন্ধ্যায়—
এখন সে রঙে ছেয়ে পথঘাট, সারাদেশ
ঘাতকের অশুভ আস্তানা।

আগি আর আমার মতোই বহুলোক—
রাত্রিদিন ভুলুষ্ঠিত ঘাতকের আস্তানায়, কেউ মরা, আধমরা কেউ,
কেউ বা ভীষণ জেদী, দারুণ বিপ্লবে ফেটে পড়া চতুর্দিকে
মানবিক বাগান, কমল বন হচ্ছে তখনছ।

বুঝি তাই উনিশশো উনসত্তরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের খাবার সন্মুখে।
সালামের বুক আজ উন্মথিত মেঘনা,
সালামের চোখ আজ আলোকিত ঢাকা,
সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ববাংলা।

দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই

জনসাধারণ

দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো
ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা—
আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে
এখনো বীরের রক্তে ছঃখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবে বিশাল চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়। সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ,
শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর ছঃখের ছায়ায়।

আসাদের শার্ট

শামসুর রাহমান

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত করবীর মতো কিম্বা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায় ।

বোন তার ভায়ের অম্লান শার্টে দিয়েছে লাগিয়ে
নক্ষত্রের মতো কিছু বোতাম কখনো
হৃদয়ের সোনালি তন্তুর সূক্ষ্মতায় ;
বর্ষিয়সী জননী সে-শার্ট
উঠোনের রৌদ্রে দিয়েছেন মেলে কতদিন স্নেহের বিশ্বাসে

ডালিম গাছের মুছ ছায়া আর রোদদুর-শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে-শার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি চূড়ায়
গম গমে এভেন্যুর আনাচে কানাচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায় ।

আমাদের দুর্বলতা, ভীকতা, কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক ;
আমাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা ।

বিদেশ থেকে চিত্র

[সাপ্তাহিক 'জনতা' সমীপেষু]

এনামুল হক

আবার হত্যার চেউ বুড়িগঙ্গা বন্দরে উঠেছে
পাড় ভেঙে শহরের রাজপথে এনেছে প্লাবন
এতদূরে নির্বাসনে আছি তবু এড়ানো গেলোনা
সে বন্নার ক্রোধবহি ছালিয়েছে আমার হৃদয়

অনেক আশ্চর্য হয়ে ভাবি আমি ; কী সার্থক সৃষ্টি
আমাদের বাংলাদেশে বৃষ্টি-নদী-ধোয়া পলিমাটি
হৃদাস্ত চৈত্রের তীব্র খরদাহ অবজায় ঠেলে
বৈশাখের প্রলয়কে অতটুকু আমল না দিয়ে
যেখানে যৌবনবরা জীবনের রক্ত-বীজাকুর
নিয়েই নতুন জন্ম সূর্যকে করেছে আক্রমণ

এই সব চৈত্র আর বৈশাখের ষড়যন্ত্রে আজ
আমাদের বিড়ম্বিত অস্তিত্বের আরো বিড়ম্বনা
কিসে প্রতিবাদ করি এ-হত্যার কারবারীদের
এদের ঘৃণাও করা মনে হয় বাহুল্য খরচ ।

হে বন্ধু তোমাকেই

মুস্তাফিজুর রহমান

ইউক্যালিপটাস এক দুই তিন

অনেক অনেক

অনেক শিশুর মুখ, অনেক মায়ের মুখ

ঢেকে গেছে বিষাক্ত কালোর ধোয়ায়

ভিয়েতনাম বারাক্ষায় পথ হাটা রোদ

পদধ্বনি শান্ত হয়ে আসে

ঘূর্ণিঝড়ে ঘর ভাঙে বুক ভাঙে

চোখ থেকে বন্ধ্যা নেমে আসে

অসহ বৈশাখ লেলিহান সেদিনের রোদ

মেঘে ঢাকা রক্তে ঢাকা নির্লজ্জ

শঙ্কায় ঢাকা

প্রতিধ্বনি ওঠে শুধু রোজ

সব দিন শেষ রাত হলে।

বিবরে কামুক পেঁচার আহ্বান

ক্ষয় রোগে ক্লান্তিকর আয়ুহীন গান

নির্ভেজাল তোষামোদে ঢাকা।

কোন দিন নেই আর রাত্রির শব

কোন স্বর নেই তার নির্বাক সব

বীভৎস সত্যের মতো

একনিষ্ঠ উদাসীন নিঃশব্দ

হে বন্ধু তুমি জেগে আছ

যেখানে স্তব্ধ দিন সূর্যের গানে
কালো পথ রক্তলাল সংগীনে যেখানে
নির্জন মর্মরিত ইউক্যালিপটাস
এক, দুই, তিন—অনেক অনেক ।

৫

এপার বাংলা ওপার বাংলা

রবীন্দ্রনাথ

সিকানদার আবু জাফর

আমিও পেয়েছি আমন্ত্রণ

মানুষের চলাপথ বসতির গ্রাম

নগর বন্দর ঘাট হাট মেলা থেকে

প্রকৃতির সব জমি, সব জলা

রৌদ্রছায়া নক্ষত্রের অঙ্ককার থেকে ।

শীত-গ্রীষ্মে বসন্তে বর্ষায়

হেমন্ত শরতে ।

সেই সব রোমাঞ্চিত অলঙ্কার যাত্রার

সব পথে বাঁকে

আমার মুহূর্তগুলো বিধ্বস্ত কেবলি

সর্বত্রের পটে অঁকা

তোমার স্বাক্ষর চিনে চিনে ;

সমস্ত শব্দের নদী বেয়ে

তোমার সুরের ঢেউ আর

আমার প্রাণের কূল থেকে

অনুভূতি থেকে

তোমারই ভাষায় তার প্রতিধ্বনি শুনে

আমি শুধু অপমান ম্লান ।

বার বার মৃত্যু মেনে-নেয়া

অপৌরুষ জানি

তবু তো পারি নি

হাজার মৃত্যুর থেকে নিজেকে বাঁচাতে ।

রক্তাক্ত মানচিত্র—৭

আমার দিগন্ত জোড়া পূর্ণবাহু আলিঙ্গন

তোমার নামেব

আমি তাই হতমান হাজার মরণে ।

তবু তো সান্ত্বনা ছিল

আশ্রিতের নিবিঘ্ন জীবন

কামা যদি হত !

রক্তকের হাত ধরে পথের কণ্টক এড়াবার

তৃপ্তি যদি ততখানি লোভনীয় হত ।

হোক না বিবর্ণ-শীর্ণ আমার কঙ্কাল

তবু তা উজ্জ্বল হবে আর কারো দাক্ষিণ্যের

মেদ-পুষ্টি সমৃদ্ধি কুড়িয়ে ;

উর্ধ্ব থেকে কারো দান করুণা-বৃষ্টিতে

সুরভিত পারিজাত হয়ে

ঝরবে আমার ছুঁটি ভিক্ষাতৃপ্ত হাতে

আমি তাকে গেঁথে নেবো

কণ্ঠের মালায়

আমি তা চাই নি ।

আমার মালার ফুল

শিশিরে কাদায় মাখা শিউলি বকুল

আমি তা কুড়োব নিজ হাতে

তবে সে মালার গন্ধ ফাস্তান হবে ।

আমার প্রাণের মুক্ত হৃন্দের উল্লাসে

তোমাকে বেসেছি তবু ভালো

ছুঁচোখের দীপালোকে বেছে বেছে

বার বার দেখে

স্বনিশ্চিত বিচারে সম্মুখে

তাই তো এড়িয়ে যেতে চাই
তোমার আকাশ,
তোমার অব্যক্ত কোন ঘাস-লতা
শিশিরে সলিলে।

অন্ধ হয়ে অথবা কখনো অন্ধত্বের ভানে
ছুই চোখে কালো পর্দা টেনে
যদি ভালবাসতাম
তা হলে তো অসহিষ্ণু সজ্জার হতাম ;
শতশত উচুনীচু টিবি আর
পোড়োবাড়ি বটগাছ
বেলতলা খুঁজে,

হৃদয়ের খোলসের শিরনি দিতাম।
আমি তাই চোখ মেলে
খুঁজেছি প্রতাহ
আছে কিনা তেমন পৃথিবী
যেখানে প্রান্তরে পথে
দিগন্তে আকাশে
তোমার দীপের থেকে ধার করা আলো নিয়ে
জ্বলবে না সন্ধ্যা শুকতার।

হাজার শাণিত প্রশ্নে
মথিত করেছি আমি
সন্মোহিত বিভ্রান্ত চেতনা
তুমি কি দেখেছো সব কিছু ?
অনুভব করেছো কি সহস্রের অন্তরের
লক্ষ লক্ষ সুর।

তুমি কবি, অতিক্রান্ত অনাগত

যুগের সীমানা

সূর্য আর আকাশের উপমায়

তোমাকে চিনেছি,

তাই তো জেনেছি

সূর্যের মতন তুমি

পারো কি কখনো যেতে

সমস্ত আধারে।

সমস্ত আধারে তবু

অসংখ্য মানুষ আছে

আছে তার আনন্দ-বেদনা।

আকাশের মতো তুমি

কোটি কোটি দৌর-জগতের

আনন্দঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে

তাই তো শোনো নি,

সমস্ত ঝিল্লির ক্রান্ত সুর।

অসংখ্য মানুষ তবু আছে

সমস্ত ঝিল্লির সুরে রাত জেগে

জীবনের কান্না যারা শোনেন।

এইসব প্রতিবেশীদের

নিমন্ত্রণ পেয়ে

যখনি গিয়েছি

দেখেছি তোমার চিহ্ন পড়ে নি সেখানে।

তবু হুঃখ সহসা জেনেছি,
আমার যে দেখার ভঙ্গিমা
সে যে একান্ত চেনা
তোমারই জিজ্ঞাসা ।

আমাকে বেঁধে ন করে আছে
অবিশ্বাস্য অদৃষ্টের মতো ;
প্রতিমুহুর্তের বর্জনের প্রয়াসে ধিকৃত
অনিবার্য অভ্যাসের মতো ॥

রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে

আতাউর রহমান

তোমার কাব্যের দেশ আশৈশব করি অন্বেষণ
শালুক শাপলায় ভরা পুকুরের স্তব্ধ কালো জলে
মাছরাঙা পানকোড়ি—বালাকার ঝাঁক
বিবাগী করেছে মন কল্লনাকে কশাঘাত হেনে।
আষাঢ়ের বেনোজলে কোনদিন ভাসিয়েছি ভেলা
পদ্মে মেছুর বনে দৃষ্টিরা হয়েছে গতিহারী
ফাল্গুনে মছরা তলে সন্ধান করেছে কোন ডাগর চোখের
মেঘলা দিনে মাঠে মাঠে তুষাতুর হৃদয় চরেছে
গানের কলির মত এক টুকরো শান্তির আশায়।

শরতের শিউলি-ফোটা-স্নিগ্ধতায় ভরা
নতুন বধূর মত লাজনম্র হিঃগুয় বেশ—
এ বাংলার কতবার ক্লান্ত পোড়া চোখ—
করেছে সন্ধান।

তোমার কাব্যের কত ছন্দে রূপে রসে ভরা দেশ
তোমার গানের মত পেলব মধুর স্বপ্নাবেশ
কত রাত কত দিন—এ মনের কল্লনার দ্বারে
প্রথম প্রেমের মত বার বার আসে অভিসারে।
এই দেশে আশৈশব কেবলই শুনেছি
বুলবুলিতে ধান খেয়ে গেছে।

আমার প্রার্থির সুর
প্রাণের রিমঝিম বর্ষণ ধারায়
মেঘনার-পদ্মার ঢেউয়ে ঢেউয়ে
শত শত যমুনার আবর্তে প্রবাহে
কল্লোলিত গুঞ্জরিত—উদ্বেজিত—উচ্ছ্বসিত
যুগ যুগান্তর ।.....

আমার জীবন-স্বপ্ন বাংলার খেতে ও খামারে
এ বাংলার আম-জাম-নারিকেল বনের ছায়ায়
গোপন কস্তুরীসম সুরভি ছড়ায় চিরকাল ।

স্বপ্নভাঙ্গা জীবন-নির্ব্বার
কতদিন আর কতদিন
মুক্তি মোহনার পথ খুঁজবে অন্ধ হয়ে ।
প্রতীক্ষায় তার
বিরহী নারীর মত নদী শীর্ণকায়া
হা হা করে রৌদ্রদগ্ধ নালা খাল বিল
চর-চড়া-প্রান্তর-কানন ।—
পিপাসিত আশাতরু উর্ধ্বশাখা আজ
কণ্ঠে তার প্রার্থনার ধ্বনি অবিরাম
ফসল-শিশুরা মাগে মেঘ-ছায়া-বারি ॥

ঋণী

শামসুর রহমান

পুরোন। ঢাকার নেড়ী গলি ছেড়ে আজিমপুরের
তেতলার ফ্ল্যাটে যাই বস্তুত আড়ার লোভে খানিক হাঁপাই।
ক্রান্তির কফিন ঢাকা শরীর এলিয়ে কোঁচে নিঃশব্দে দূরের
আকাশে ব্লাই চোখ এবং বৈশাখী গরমেও স্বস্তি পাই
বন্ধুর সুহাস মুখে ; উপরন্তু ভাগ্য বলে ফাহিমদা এখানে অতিথি
আজ রাতে । আমাদের প্রহর সমৃদ্ধ হবে, রাবীন্দ্রিক সুরে
নানান বিজ্ঞাসে অবিরাম তুলবে সম্ভার মৌন বাউবীথি,
জাগবে আনন্দলোক তেতলার ফ্ল্যাটে সরকারী আজিমপুরে ।

ফাহিমদা সুর ভাঁজে এ-ও এক বৃষ্টি অপরূপ,
অস্তিত্ব ডুবিয়ে নামে । গীত বিতানের কিছু নিভৃত নিশ্চূপ
পাতা ওড়ে অলৌকিক কলরবে, গাঙচিলের মতো ওড়ে

ঘোরে সারা ঘরে

প্রাণের উর্মিল জল ছুঁয়ে যায় কতো ছলভরে ।
ফাহিমদা কণ্ঠে সুর তুললেই ঘরে রোজ ওঠে মেঘে মেঘে
বাজে বাঁশি ভাসে ভেলা শ্রাবণের ধারা ঝরে গাছ হয়, হাট-
ফেরা লোক মিলায় দোনার মেঘে এবং চোখের দ্বারে ধ্যানের

আবেগে

নদীর সুদূর পায়ে যায় দেখা ঘাট ।

কখন যে রাত্রি বাড়ে আলো-অঁধারিতে তেতলায়,
কিছুই পাই না টের সুরে ভেসে, ফ্ল্যাটে ফাহিমদার গলায়,
আমার সোনার বাংলা বলমল ক'রে ওঠে । ঋণী তারই কাছে
আজীবন, কণ্ঠে যার বারবার ররীন্দ্রনাথের গান বাঁচে ।

রবীন্দ্রনাথ

আল মাহমুদ

এ কেমন অন্ধকার বঙ্গদেশ উত্থানরহিত
নৈঃশব্দ্যের মস্ত্রে যেন ডালে আর পাখিও বসে না
নদীগুলো ছুঃখময়, নির্পিতগ মাটিতে জন্মায়
কেবল ব্যাঙের ছাতা, অন্য কোন শ্রামলতা নেই।

বুঝি না, রবীন্দ্রনাথ কি ভেবে যে বাংলাদেশে ফের
বৃক্ষ হয়ে জন্মাবার অসম্ভব বাসনা রাখতেন।
গাছ নেই নদী নেই অপূর্ণক সময় বইছে
পুনর্জন্ম নেই আর, জন্মের বিরুদ্ধে সবাই।

গুনুন রবীন্দ্রনাথ, আপনার সমস্ত কবিতা
আমি যদি পুঁতে রেখে দিনরাত পানি ঢালতে থাকি
নিশ্চিত বিশ্বাস এই একটিও উদ্ভিদ হবে না
আপনার বাংলাদেশ এরকম নিষ্ফল ঠাকুর!

অবিশ্বস্ত হাওয়া আছে নেই কোন শব্দের ছোঁতনা
ছ' একটা পাখি শুধু অশ্বখের ডালে বসে আজও
সঙ্গীতের ধ্বনি নিয়ে ভয়ে ভয়ে বাক্যলাপ করে ;
সৃষ্টিহীন বোশেধের নিঃশব্দ পঁচিশ তারিখে।

রবীন্দ্রনাথের নামে
আবুবকর সিদ্দিকি

যতক্ষণ তোমার বাসায়
পোষা ছিলাম
শরীর উষ্ণ ছিল,
তারপর
মাটিতে পা দিতেই
আগুন আগুন।
পথে বেরোতে
আততায়ী নিল পিছু।
অগতির গতি
তোমার ইষ্টনাম জপি
হাঁটি
তেড়ে আসে কয় মগ
গুনি
এটা মগের মূলুক,
নজরানা নিয়ে
সরে পড়ে মহাপুরুষেরা
তত্ত্ব দিয়ে যায় কানে
—বনে যা, বনে যা
কচু খা গে যা।

আসলে বুনোরা
বন ছেড়ে এসে দাবড়ে বেড়ায়

আমাদের আশপাশে
অথচ চিনি নে ভোলের ঠালায়
চাল চুলো নেই
তবু তারাই
পণ্ডিত টুলো স্থায়রত্ন
অথবা আমাদের বাবা।
মাংসটুকুন খাবলে খেয়ে নিলে
পথে পথে।
শ্রেফ কঙ্কালে
পাড়ি সেরে শেষে দেখি
মাথার উপরে
সেই সনাতন আকাশ,
চারদিকে গুনি
সেই নাম বাতাসে
চিরায়ু।
মেঘে মেঘে বেলা
যায় না,
তাকে ঘিরে ঘুরি আমরাই
যত পরমাণু।

মূলতঃ
সূর্য
প্রাণের উষ্ণ বাস।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

নিয়ামত হোসেন

আমাকে কুচি কুচি করে কাটলেও
রক্তমাংস সবটুকুই
বাঙলা
হৃদয়ের দুঃখশোক প্রেম, শাস্তি সবটুকুই
বাঙালী

বাঙলার বড় বেদনা
তবু এ বেদনা ছাড়াও
অনেক গল্প নাটক সাহিত্য
অনেক গানে গানে
অনেক ভাষার বেদনা
হৃদয়ে অনুভব করি
অনেক সেক্সপীয়র দাস্তে তলস্তয়ের স্মৃতিতে
মাথা নিচু হয়
কিন্তু আমার হৃদপিণ্ডের রক্তধারায়
গোটা একটা রবিঠাকুর।

খেতে শুতে উঠতে বসতে
বিরহে মিলনে
হৃদয়ের কানে কানে গান গায়
রবীন্দ্রনাথের ভাষা

হৃদয়কে ঘর পার করে পৃথিবীর পড়শীদের সাথে
মিতালী পাতিয়ে আনে
এই ভাষা
প্রতি পদক্ষেপে পরাজয়ের পর পালবার পথে
মস্তিষ্কের কোষে কোষে
হৃদয়ের অলিতে গলিতে
নিঃশব্দে পদচারণা করে ফেরে
সবাক অথবা নির্বাক
তামাদের রবীন্দ্রনাথের ভাষা
এ ভাষাই
রবীন্দ্রনাথ
আমারও বাঙলা।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে বৃষ্টি

হুমায়ুন কবির

অন্তরঙ্গে বৃষ্টি পড়ে রক্তশ্রোতে কোমল গল্লার
আমপাতা জামপাতা সুশরীরী ভেজা বট নড়ে
জল পড়ে পাতা নড়ে
জল পড়ে পাতা নড়ে, সুনীল কদম
একাকার জলে আর জলে
অপরাহ্নে শান্তি এলে বৃষ্টির করুণা ধারা বেয়ে
শ্মশানে বাসক পাতা দ্রোণ ফুলে দক্ষিণার হাত
জ্যৈষ্ঠের বিকেলে বৃষ্টি, বৃষ্টি ঝরে নিবিড় সেতার ।

বৃষ্টিতে একাকী ঘরে নিঃসঙ্গে ও ওন্দার ভিতরে
ব্যথিত বাউলে ডাকি সন্ধ্যাটের মত যার মুখ
'বাজাও বিষন্ন সুর আকাশের বৃকের কথারা ।
সারাটি প্রহর জুড়ে ঝলুক নয়নে বৃকে চেতনার গালে ।
ব্যথিত বাউল এক সন্ধ্যাটের মত যার মুখ
পদাবলী অশ্রু যার ; শিহরিত দেওদারে সুখ ।

কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি

শামসুর রাহমান

একদা কবিতা তার বুক নগ্ন করেছিলো আপনার চোখের সম্মুখে,
আপনি সে নগ্নতায় দেখেছেন নিজেরই মনের সূর্যোদয়।
একদা কবিতা তার স্তনের গোলাপ কুঁড়ি চেয়েছিলো দিতে,
আপনি সে গোলাপের উজ্জলতা ছেড়ে
কাল ষোশেখীর ঝড়ে চকিতে গেলেন ছুটে, বাগ্মিতা নামের
দজ্জাল মেয়ের কাছে, যার কিশু তুমুল নর্তনে স্বপ্নগুলি
পড়লো ছড়িয়ে ভাঙা ঘুঙুরের মতো।

কতদিন হার্মনিয়ামের রীড়ে নিপুণ আঙুল
তগ্নয় নাচে নি আর কতদিন কামিনীর ঠোঁটে
অঁকেন নি প্রগাঢ় চুম্বন।
এখন আপনি সেই যাত্রী আত্মভোলা, হঠাৎ যে নেমে পড়ে
ভুল ইষ্টিশানে অবেলায়।
তবু আপনার মতো কারুকেই চাই, চাই আজো নজরুল ইসলাম

সুপ্রভার তরঙ্গিত সুরের মতোই
হাওয়া ছুঁয়ে যায়
অস্তিত্বের তট,
এবং পবিত্র গাঙ্গুলীর ছুটি অক্ষিগোলকের প্রসন্ন রশ্মির মতো
দিবালোক আসে,
প্রমীলার হাদির মতোই জোৎস্না করে আপনার
বুকের নির্জন মরু এবং পায়ের অন্তরীপে।

তবুও বুকের মধ্যে কথা

নৈশক্যের গভীর মোড়ক-ছেঁড়া কথা

হয় না এমন উচ্ছ্বসিত ।

আপনার মগজের কোষে কোষে মৃত প্রতিধ্বনি কবিতার ?

কোন পুলিনের খুব স্মৃতিময় বকুল গাছকে

অনেক পেছনে ফেলে ছায়াচ্ছন্ন বারান্দায় শুধায় ফেরারী বুলবুল :

কেমন আছেন নজরুল ইসলাম ?

কাবেরী নদীর জল, পদ্মার উত্তাল ঢেউ প্রশ্ন করে আরো :

কেমন আছেন নজরুল ইসলাম ?

বাহুড় বাগান লেন এবং মন্মথ দত্ত রোড

বেলগাছিয়ার

প্রতিটি সকাল আর প্রতিটি সন্ধ্যায় করে প্রশ্ন :

কেমন আছেন নজরুল ইসলাম ?

সারা বাংলাদেশের ব্যাকুল কণ্ঠে সেই একই প্রশ্ন :

কেমন আছেন নজরুল ইসলাম ?

বর্ষার বাংলার কবিকে
উৎসর্গ : কাজী নজরুল ইসলাম
হারাৎ নামুদ

রাত্রির গেলসে জল । আঙ্গিনায় বিছানো মোশুমী ।
জানালার বাইরে আবণী যুথিকা ।

তবুও চাক্ষুস খিলান অকুটিতে উড়িয়ে, মর্মর অলিন্দ
আমরা পা টিপে পা টিপে, আমরা শাল-তমালের বনে
ঘুরে ঘুরে বেড়াবো । গভীর নদীটির হা-হা-হা অটহাস,
মস্ত সেই পাহাড় ছ'পায়ে মাড়িয়ে বিশাল ধাবায়
আমরা সূর্য ছিনিয়ে নেবো ।

কেননা কান পাতলেই টের পাই, পাজরের তলায় একটি
জ্যোতির কণিকা, অথচ বাগিচায় উড়ে গেছে বুলবুল,
ধমনীতে পাখোয়াজ বাজে না ॥

কবিরাজ রমেশ শীল

শামসুর রাহমান

কিন্নর কণ্ঠের খ্যাতি ছিল না তোমার, কোনদিন
জল কিন্নরীর ধ্যানে, ঈশ্বরের বিফল সন্ধ্যানে
কাটে নি তোমার বেলা । কুলীন ড্রইংরুমে কিন্না ফিটফাট রেস্টোরায়
হও নি কখনো তর্কপরায়ণ সাহিত্যের সৌখিন আড্ডায় ।
ছিল না তোমার মন ভ্রমকালো শিল্পের মহলে, আলোকিত
প্রভাত বেলায় তুমি যে-শিল্পের পেয়েছিলে দেখা
ভীষণ তামাটে তার গ্রীবা রৌদ্রের স্নাত্তি আছে ।

স্বদেশকে প্রিয়ান একান্ত নাম ধরে ডেকে ডেকে
অগ্নিবলয়ের মধ্যে গড়েছিলে প্রেমের প্রতিমা
নিজে পুড়ে পুড়ে ।

তোমার প্রেমার্ত্ত স্বর পঞ্চান হাজার
একশো ছাব্বিশ বর্গ মাইলের আনাচে কানাচে
পৌঁছে গেছে । বাউলের গেকুরা বস্ত্রের মতো মাটি, মাঠ আর
আকাশের কাছে
নদীর বাঁকের কাছে, মজুরের ফিপ্র পেশী, অত্যাচারী শাসক-ছপু
কৃষকের হাল-ধরা মুঠোর কাছেই তুমি শিখেছিলে ভাষা ।

বস্তুত এখনো কম-বেশী আমরা সবাই যাত্রা ভালবাসি,
এমন কি নিজেরাই 'অধিকারী পাট দাও' বলে

সমস্বরে ভীষণ চেঁচাই,
সহাস্ত বাড়াই মুখ রঙচঙে মুখোশ পরার লোভে আর নিজের
কাপ্তান কাপ্তান লাগে কিনা দেখে নিই আড়চোখে

বিকৃত আয়নায়, ঘাড়ে মুখে আলতো বুলিয়ে নিয়ে পাউডার
পরস্পর খুব করি খুনসুটি। ইদানীং আমরা সবাই
অন্ধ মুক আর বধিরের পাট ভালবাসি। অথচ তোমার
ভূমিকা সর্বদা ছিল ভিন্নতর। অন্ধকারে থেকে, মনে পড়ে,
দেখতাম রুদ্ধবাক-প্রধান যাত্রায় তুমি রাজপুত্র, নিঃশব্দ, সুকান্ত,
সোনার কাঠির স্পর্শে নিদ্রিতা সত্যকে
অরেশে জাগাতে চাও, অভিশপ্ত রাজ্যের উদ্ধারে
কোষমুক্ত করো তরবারি। তুমি পাষণ পুরীর
প্রতিটি মূর্তির স্তব্ধতায় চেয়েছিলে ছিটোতে রূপালি জল।

চোখ বুজলেই দেখি, হু হু মাঠে, কুটিরে, খেলার ঘরে, দুঃখ-ছাওয়া
শেডে

সুস্থির দাঁড়িয়ে আছে। সুদিনের কর্ণিষ্ঠ নকীব।

এসে আছেন শহীদুল্লাহ,

শামসুর রাহমান

এসাবলী প'ড়ে আছে, লেখার টেবিলে চশমা, কালো টুপিটায়
জমছে মসৃণ ধুলো এবং জায়নামাজ, পুণ্য স্মৃতিময়,
নিবিড় গোটানো একপাশে। প্রাতরাশ ঠাণ্ডা হচ্ছে ব'লে কেউ
ডাকবে না ঘন ঘন। প্রত্যহ বাড়বে বেলা, মধ্য রাতে একে একে বাতি
নিভবে প্রতিটি ঘরে। কদিনী চেয়ার ছেড়ে এস্বাগার থেকে
বেরিয়ে আপনি আর সিঁড়ি বেয়ে যাবেন না একা

দোতলায়, মগজের নন্দিত নিকুঞ্জ
আধ্যাতিক পাখির অর্গত্যা গানে গুঞ্জরিত হবে না কখনো।

দুশ্চরিত সময়ের কাছে আপনাকে নতজানু হতে কেউ
তাঁকে নি কখনো, আপনার আচকান পেয়েছে সক্ষম পাখা
নিষ্কলুষ নীলিমায়। হে বিজ্ঞা, হে প্রজ্ঞা, মনীষার মন্বন্তরে
ছিলেন বিপুল অনসৃত, যে যেমন খুশি নিয়েছে অঞ্জলি পেতে বার বার।
এমন আছেন এসে, বাংলার স্মৃতিতে ছলছলে দরোজায়।

সেই কবেকার অপরূপ শৈশবকে কোন জাহ্নু বলে চির
প্রতিবেশী করে রেখেছিলেন মায়াবী কুঠুরিতে,
ভেবেছি বিস্ময়ে কতদিন। অন্তিমেষণে
আলোকিত শতযুরি একটি বৃক্ষের কাছে চেয়েছেন পৌঁছুতে সর্বদা।

সোনালি মাছের মতো উঠতো লাফিয়ে
প্রবীণচোখের নিচে নিত্য অভিধানের শব্দে
বার বার, সন্নেহে দিতেন ঠাই একান্ত মানস

সরোবরে । পাণিনীয় সূত্রের মায়ায় হেঁটেছেন গহন জটিল পথে
দীর্ঘকাল প্রস্রাবতুর । বাংলা ব্যাকরণ রাজনর্তকীর মতো
মদির কটাক্ষ মেলে আপনাকে ডেকে নিয়ে গেছে
অন্তঃপুরে, সহবাসে বিনোদের ধ্বনি অতঃপর
সামাজিকতায় বেজে ওঠে ঘরে ঘরে ।

অন্ধকারে যাবো না কখনো, অন্ধকার
আমাকে ভীষণ ক্রুদ্ধ করে, করতেন উচ্চারণ মনে মনে
হয়তো বা ; আপনাকে আলোর প্রেমিক
জেনেছি সর্বদা । অন্ধকারে যাবেন না, যাবেন না কোন দিন
আমরাও বলেছি ব্যাকুল ।

অথচ পেছনে সীমাহীন অন্ধকার ফেলে, শুধু
কতিপয় গ্রন্থ হ'য়ে উদাস গেলেন চ'লে অথ অন্ধকারে ।

মহাত্মাজীর প্রতি ভগৎ সিং
দিলওয়ার

মহাত্মাজী, এখন আমরা এক অবিনশ্বর
সমতার প্রান্তরে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা কামনা বাসনা—এ সমস্তই
এখন এক অপূর্ব রূপকথা,
এবং এমনি এক অননুসাধারণ লগ্নে,
মহাত্মাজী, তোমাকে বলতে ইচ্ছে করে,
আমার মরদেহের অকুতোভয় পরিক্রমায়
তোমার ‘পতিতপাবন’ স্বরূপ যদি
থাকতো আমার দৃষ্টির যোজন যোজন মাইল দূরে !
তোমাকে যদি সেইদিন কোন অভিযাত্রি দল
হিমালয়ের কোন দুর্গম অঞ্চলে খুঁজে পেতো
তপস্লামগ্ন—
তা হলে হয়তো রাম-রহিমের শত্রুকে হানার
প্রোজ্জল ইতিবৃত্তি
প্রিয়জনদের রক্তে হতো না কলঙ্কিত,
মহাত্মাজী, সাগরপারের খুনীদের কণ্ঠে
তোমার জয়ধ্বনি শোনো,
সাপের উদ্ধত ফণায় তোমার মালাদানের কথা
তারা তো ভুলতে পারে না কখনো ।
পাপিষ্ঠ নাথুরাম, তারো চেয়ে বড়ো যম—
আমাদের সত্যিকার সংগ্রামী ইতিহাস
কালের খাতায় নাম লিখিবার আগেই
সে তোমায় দীর্ঘায়ুতে অভিবিক্ত করেছিলো ।

বাংলার বাঘ

আবুল হোসেন

সে বাঘ ডাকবে না আর একদিন যার ডাক শুনে
হালের লাঙল ফেলে খেতে খালের গাঙের ঘাটে
মস্জিদে ঈদগার মাঠে রেস্টোরাঁয় পার্কে ফুটপাতে
কী শীত কী গ্রীষ্ম লোকে লোকারণা, ভিজে দাঁড়াক
সারা দেশ বার বার বরষায়। ছুঁচোখে শোকের বত্ম
অথবা কৌতুক মুখ কখন উচ্ছল, কখন বা
কঠিন শপথে হাত মুঠো করে। নিশ্চিত নির্ভয়ে
শুয়েছে সমস্ত দেশ সে যখন বাংলার চৌকাঠে
বসে ছিলো থাবা মেলে। একটুখানি লেজের ঘূর্ণিতে
ছিন্নভিন্ন শেয়ালের পাল। সে ছিলো দেশের আগে
কিন্মা দেশ ছিলো তার, কে কবে ভেবেছে। দিয়েছে সে
সবই তার যা ছিলো দেবার। ভালবেসে শূন্য হাতে
ফিরতেও তার বাধে না কখনো। তাই আজীবন
হৃদয়ের উষ্ণতা বজায় রাখতে সে পেরেছিলো
প্রেমের আগুনে। আর যতবার জিতেও হেরেছে
দেশ তাঁকে বসিয়েছে হৃদয়ের সিংহাসনে তার।

শেরে বাংলার স্মৃতি

ফজল শাহাবুদ্দীন

তোমার স্মৃতিকে বাংলাদেশ কোনদিন ভুলবে না
তুমি নেই তবু তোমার স্মৃতির গান চিরচেনা
রুষ্টির ধারার মতো স্নিগ্ধ ছুঁয়ে যায়
এ দেশের মাঠ অরণ্য পাহাড় ; হাওয়ায় হাওয়ায়
তোমার নামের ধ্বনি কারা যেন আনে সঙ্গোপনে
সোনালি শস্যের মাঠে হিরন্ময় রৌদ্রে পুষ্পিত কাননে
আমাদের রক্তে প্রাচীন মাটিতে ধানশীষে পাটে
ঘরের পৈঠায় আর দরোজায় অতল চৌকাঠে
তোমার স্নেহের ছায়া মনে হয় আজো লেগে আছে
আকাশের কাছে
তাই নিশিদিন তোমার উপমা খুঁজি,

সে কথা কখনো তুমি জানবে না

তোমার স্মৃতিকে বাংলাদেশে কোনদিন ভুলবে না ।

তোমার স্মৃতিকে কোনদিন পারবে না ভুলে যেতে
তুমি এক কিংবদন্তী অন্তরঙ্গ গৃহে গঞ্জে খেতে
গ্রামের নির্জনে আর শহরের দীপ্ত কোলাহলে—
নিছৃত গানের মতো শ্রাবণের ঢলে
তুমি বেঁচে রবে চিরদিন এই আমাদের দেশে,
আত্মার গভীর গানে শীতে গ্রীষ্মে শুধু ভালোবেসে
তোমাকে আনবো ডেকে রাত্রিদিন সকাল সন্ধ্যায়
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে দীপ্ত নিরবধি হাওয়ায় ;
তুমি জানবে না কভু জানবে না
তোমার স্মৃতিকে বাংলাদেশ কোনদিন ভুলবে না ।

৬

বিজ্ঞপ, স্মৃণা, ক্রোধ, হরতাল, মিছিল, মৃত্যু ও সংগ্রাম

অবাক দেশের জাতীয় সঙ্গীত
সিকানদার আবু জাফর

মূল গায়েন ।

আমাদের সব আছে ভাই সব আছে

সাজ আছে রূপসজ্জা আছে

হাড়ের নলে মজ্জা আছে

গরজ মত গলায় গলায়

ছক্কাছয়া রব আছে ॥

দোহার ।

ছক্কাছয়া রব আছে ।

সকলে ।

ছক্কাছয়া রব আছে,

সব আছে ভাই সব আছে ॥

মূল গায়েন ।

আমাদের মুরগীরা দেয় আঙা পেড়ে,

দোহার ।

আঙা পেড়ে

মুঃ গাঃ ।

বাঁড়গুলো দেয় ডাঙা নেড়ে

দোহার ।

ডাঙা নেড়ে

মূল গাঃ ।

বকনাগুলোর বাঁট ভরে তাই

মিষ্টি ছুধের স্বাদ আছে ।

সকলে ।

মিষ্টি ছুধের স্বাদ আছে

সব আছে ভাই সব আছে ॥

মূল গায়েন ।

আমাদের গাভীর কোলে বাছুর আছে

দোহার ।

বাছুর আছে

মুঃ গাঃ ।

বালিশ কাঁথা মাছুর আছে

দোহার ।

মাছুর আছে

মূঃ গাঃ । দিনের বেলার ধোঁকার খোকা
 রাত্রে পেঁচোর বাপ আছে ॥
 সকলে । রাত্রে পেঁচোর বাপ আছে
 সব আছে ভাই সব আছে ॥
 মূল গায়েন । আমাদের হাঁক আছে আর ডাক আছে
 দোহার । ডাক আছে
 মূঃ গাঃ । হঠাৎ-বড়র জাঁক আছে
 দোহার । জাঁক আছে
 মূঃ গাঃ । আমাদের স্মৃখ পিছন দুই দিকেতেই
 ছড়কো দেবার ফাঁক আছে ॥
 সকলে । ছড়কো দেবার ফাঁক আছে
 সব আছে ভাই সব আছে ॥

মূল গায়েন । আমাদের ঢাক আছে আর ঢোল আছে
 দোহার । ঢোল আছে
 মূঃ গাঃ । নানান রকম ভোল আছে
 দোহার । ভোল আছে
 মূঃ গাঃ । ছপুর রাতে ঘরে ফিরেও
 খোকার মায়ের কোল আছে ॥
 সকলে । খোকার মায়ের কোল আছে
 সব আছে ভাই সব আছে ॥

মূল গায়েন । আমাদের মাথায় ভরা ঢাক আছে
 দোহার । ঢাক আছে
 মূঃ গাঃ । বিশাল পেটের ঢাক আছে

দোহার ।	ঢাক আছে
মুঃ গাঃ ।	আমাদের প্রাণের ওপর আজরাইলের চিরদিনের তাক আছে ॥
সকলে ।	চিরদিনের তাক আছে সব আছে ভাই সব আছে ॥
মূল গায়েন ।	আমাদের আইন কানুন ধর্ম আছে
দোহার ।	ধর্ম আছে
মুঃ গাঃ ।	ঈমানদারীর ধর্ম আছে
দোহার ।	বর্ম আছে
মুঃ গাঃ ।	বাইরে ঘরে ক্লাস্তিবিহীন নিত্য কৃষি কর্ম আছে ॥
সকলে ।	নিত্য কৃষি কর্ম আছে সব আছে ভাই সব আছে ।
মূল গায়েন ।	আমাদের ধমক আছে ঠাট আছে
দোহার ।	ঠাট আছে
মুঃ গাঃ ।	কথার কথায় ঘাট আছে
দোহার ।	ঘাট আছে
মুঃ গাঃ ।	ঠাঙা ঘরে আরাম করার নড়বড়ে সব খাট আছে ॥
সকলে ।	নড়বড়ে সব খাট আছে সব আছে ভাই সব আছে ॥
মূল গায়েন ।	আমাদের শাশান আছে গোর আছে
দোহার ।	গোর আছে
মুঃ গাঃ ।	ডাকাত আছে চোর আছে
দোহার ।	চোর আছে

মূল গাঃ । ভাবনা জুড়ে অষ্ট প্রহর
কেয়ামতের ঘোর আছে ।
সকলে । কেয়ামতের ঘোর আছে
সব আছে ভাই সব আছে ॥

মূল গায়েন । আমাদের যম আছে আর কাল আছে
দোহার । কাল আছে
মুঃ গাঃ । শূল আছে আর শাল আছে
দোহার । শাল আছে
মুঃ গাঃ । তাই বগল বাজাই ছ'চোখ রেখে
মাঠের নেড়া তাল আছে ॥
সকলে । মাঠের নেড়া তাল গাছে
সব আছে ভাই সব আছে ।

মূল গায়েন । শুধু নেই ত' রে ভাই খুলির খোলায়
একটি ছটাক ঘুত,
তাই বলে কি আমরা সবাই
পশুর খাঁচায় ধুত ?
সকলে । তাই বলে কি আমরা সবাই
পশুর খাঁচায় ধুত ?
দোহার । না না না আমরা স্বাধীন
সকলে । আমরা স্বাধীন
তবলার বোল । ধাগে ধিনাগ তাকিটি ধিনাগ
তাক তাক তাক ধিনাগ ধিনাগ
দোহার । আমরা স্বাধীন আমরা আজাদ

তবলার বোল । ধাত্রেকে ধিনাগ তাত্রেকে ধিনাগ
তাক তাক তাক ধিনাগ ধিনাগ ॥

মূল গায়েন । এমন স্বাধীন কে আর আছে
সকলে । এমন স্বাধীন কে আর আছে
সব আছে ভাই সব আছে
গরজ মত গলায় গলায়
ছক্কাছক্কা রব আছে.....॥

তবলার বোল । দিদ্ দা বি নাক তেটে তেটে
খেটা বাঁতা গুরু গুরু গুরু গুরু ॥

একটি কবিতা সম্পর্কে

সরদার ফজলুল করিম

শহীদ সাবেরের 'শোকাক্ত মায়ের প্রতি' কবিতাটির একটি অংশ আমার নিজের বন্দী জীবনের একটি খাতার পৃষ্ঠায় সম্প্রতি আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করি। প্রায় বিশ বছর আগের কথা। কিশোর শহীদ সাবের আমারই ছায় জেল থেকে জেলাস্তরিত হ'তে হ'তে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে এসে আমার সঙ্গে দৈবক্রমে মিলিত হয়েছিলেন। কিছুদিন আগে আমরা একসঙ্গে ঐ জেলের কোন ওয়ার্ডে থাকতে পেরেছিলাম। রাজশাহীর সাঁওতাল কৃষকদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন পূর্ববাংলার আন্দোলনের মধ্যগণি ছিল। আর সে আন্দোলনের সঙ্গে ইলা মিত্রের নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ইলা মিত্র ছিলেন সাঁওতাল কৃষকদের প্রিয় ভগিনী, তাদের আন্দোলনের নেত্রী।

ইলা মিত্রের প্রেপ্তার এবং তার উপর অনুষ্ঠিত নির্যাতন তখনকার সংগ্রামের উপকথায় পরিণত হয়েছিল। সে কাহিনীর ভিত্তিতে শহীদ সাবের তাঁর 'শোকাক্ত মায়ের প্রতি' কবিতাটি রচনা করেন। এ কবিতা কোথাও মুদ্রিত হয়েছিল কি না আমার জানা নেই। বন্দী-জীবনের দৈনন্দিনের মানসিক উপকরণ হিসাবে নানা প্রকার কবিতা ও আলোচনার সংগ্রহে আমার যে খাতাটি ভরে উঠেছিল তারি একদিকে আমি তুলে রেখেছিলাম কবিতাটি তাঁর নিজের পাণ্ডুলিপি থেকে। কিন্তু এর শেষাংশটি আমার খাতায় ছিলো না।

শহীদ সাবের আজ স্মৃতির সংকটে অনেকটা বিভ্রান্ত। হয়ত এ রচনাকে পুরোপুরি নিজের রচনা বলে চেনার ক্ষমতাও নেই।

শহীদ সাবেরকে আজকের অনেকে চেনেন না। যাঁরা চেনেন তাঁরা তাকে করুণা করেন। কিন্তু এই কিশোরের প্রতিভা ছিল, মনে

স্বপ্ন ছিল। মহত্তর আগামী স্বপ্নে একদিন যিনি পরিবার-পরিজনের
আকর্ষণ উপেক্ষা করে প্রগতিশীল আন্দোলনের সক্রিয় কর্মতৎপর
জীবন গ্রহণ করেছিলেন। সেই অপরাধে দীর্ঘদিন কারাবাস
করেছেন। পূর্ববঙ্গের সাহিত্য আন্দোলনের এবং সংগ্রামের ইতিহাসে
বিকাশোন্মুখ, কিন্তু শুদ্ধ এই তরুণের অবদানের কথা স্মরণ করতে
গিয়ে তাঁর কবিতার অংশটি আমার খাতার পৃষ্ঠা হতে তুলে দিলাম।

শোকাত' মায়ের প্রতি

শহীদ সাবের

মায়ের কাছে লেখা জনৈক রাজবন্দীর চিঠি

চট্টগ্রাম জেল : ২৫/১১/৫১

মা গো, মা আমার কাঁদছ তুমি ?

আমাকে একবার দেখো

দেখো, আমি স্থির, অটল, চোখের পাতাটি নড়ছে না

চেয়ে দেখ, আমার হাতে লাল মলাটের বই

কারাপ্রাচীরের আড়ালে, লুকিয়ে আনা বইটি।

এখন আমার চোখে ভেসে উঠেছে

সে তো তোমারি ছবি মা গো

সবে দশের পাতায় হাত দিয়েছি

ভেসে উঠেছে আমার মনের পদ'ায় অলগা মায়ের ছবি

মা গো কি শীত এখন ! তোমার গায়ে কেবল একটি জামা

কি তুষার পড়ছে এবার ! রক্তহীন মৃত্যুর ধাতু,

এমন দিনের মৃত্যুর দেবতার মুক্ত,

চারদিকে রক্ত জমানো হিমেল মৃত্যু

আর তুমি দাঁড়িয়ে আছ জার্মান কমান্ডারের সামনে,

মা গো ক্যাপ্টেন ভেনের কি বুঝবে বলো
কেন তুমি যোগ দিয়েছ গেরিলা দলে
স্বদেশ প্রেমের আগুন কত জ্বলে—

পরাজ্য লোভী নাৎসীরা কি বুঝবে তা।
গত কালকে রাতে তুমি যে স্বহস্তে দিয়েছ উড়িয়ে
ইউক্রেনের সেই পুন্ডি।

জার্মানদের দেবে না মাগো এক ইঞ্চিও সবহারাদের জমি,
মাগো তুমি পণ করেছ, জবাব দেবে না
স্বস্তিকাধারী পশুর সওয়ালের।

মা গো দিও না, দিও না।

মাগো ইউক্রেনের বাচ্চা ছেলেরা
তাদের অলগা মাকে কখনো ভুলবে না।
মাগো তুমি তো তাদের মা

স্বর্গাদপি গরীয়সী

তাদের কথা তুমি জার্মানদের বলো না
মাগো কিশোর গেরিলাদের জীবন-মরণ করছে নির্ভর
তোমার একটি কথার উপর।

গেরিলারা কোথায়? উত্তরে? পূর্ব?
কোন দিকে কোন জঙ্গলে? বলো না, বলো না।
বলো শুধু তারা সারা ছুনিয়ায়।

মাগো তুমি পারছোনা দাঁড়াতে আর

তোমার পেটে যে সন্তান

তুমি যে গর্ভধারিণী মাতা আরো একটি শিশুর,
ও কি! ক্যাপ্টেন ভেনের তোমার গায়ের কাপড় তুলছে।
দেখতে চায় সে তুমি সন্তানবতী কিনা?

দেখুক, দেখুক, প্রাণ ভরে দেখুক ভেনের
লজ্জা কি গো অলগা মা

তুমি যে আছ বহন করে সবহারাদের আর একটি সেনা
মা গো, কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তোমার

মুখের মাংসপেশী কী ভীষণ পুরুষালী

না, না, বলবে না আমার অলগা মা

দেখ না ক্যান্টেন যাচ্ছে চলে।

তারপর আমি দেখছি পরিষ্কার

সেই হাড় কাঁপানো শীতের রাতে, সেই ছঃসহ শীতে

তুমি উলঙ্গ, মাগো, তুমি উলঙ্গ

সেই বরফের আচ্ছন্নতার উপর দিয়ে বীর পদক্ষেপে তুমি

চলেছ হেঁটে মা গো, পেছনে বেয়নেটের ডগা

ছুঁয়ে আছে পিঠেতে তোমার

দস্যুরা হাসছে, মা গো মাতৃমূর্তির নগ্নতায় ;

তোমার সন্তান ভরা পেট ঝুলে পড়েছে মা গো

খোঁচায় খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত তোমার শরীর

কি যন্ত্রণা মা গো, তবু বলবে না, বলবে না।

তারপর তুমি সেই ঠাণ্ডা ঘরের মাঝে

যখন হু হু করে পড়ছে শীত, দরজা-জানালা বন্ধ

কেবল জার্মান সান্দ্রীর কলুষিত চোখ চেয়ে আছে

তোমার পবিত্র মাতৃমূর্তির দিকে

তুমি এখন জন্ম দিচ্ছ একটি সন্তানের

কি দারুণ যন্ত্রণা বলো !

একটি ক্ষুদ্র লাল মাংসপিণ্ড ; আগামী দিনের

এক সবহারার সেনা বেরিয়ে আসে ধীরে

কাঁদছে শিশুটি পৃথিবীকে প্রথমে স্পর্শের আবেগে,

কেউ কোথাও নেই। কেবল দু'টি সস্ত্রীর হাসিভরা চোখ
তুমি দাঁত দিয়ে টেনে টেনে ছিঁড়ে নিলে নাড়ী।

তারপর ভেনের ডেকেছে তোমায়
শিশুটি ছিনিয়ে নিলে তোমার কোল থেকে
ঐ তো শিশুটি ফেরাউনের পিছনে
অলগা মা আমার বলবে না কিছু
শরতান তোমার ছেলের জান কজের দিক জমকি
মা গো তুমি মা—তোমার একটি কথার পরে
করছে নিভ'র অসংখ্য তরুণ গেরিলার প্রাণ
তুমি তো জননী বলবে না একটি কথাও।
ছনিয়া কাঁপছে মা গো অলগা মা
তোমার চোখের সামনে তোমার সন্তোজাত শিশু
সুন্দর—কাঁদছে—ক্যাপ্টেন ভেনের
আবার শুধাক প্রশ্ন; গেরিলারা কোথায়
তুমি নিরুত্তর থাক। পিস্তলের নল আসে
তোমার কলিজার বেঁটা ঐ শিশুটির বুকে
চোখ বোজ, ছনিয়া ঘুরছে, তোমার চোখের সামনে
চোখ বোজ, কানে দাও তোলা—পিস্তলের আওয়াজ শুনো না—
পরক্ষণে দেখবে তাকিয়ে—তোমার আপন সন্তার
একাংশের অপমৃত্যু।

তারপর আবার সেই অন্ধকার আবার বরফ জমান মাটি
আবার উলঙ্গ শরীর, এখন তোমার সামনে বরফের খাদ
জার্মান বেসনেটের ডগায় মা তুমি প্রাণ দিয়েছ।
ইউক্রেনের তুহিন সেই নাৎসী অধিকারের দিনগুলিতে
অনশন লজ্জা সবকিছুকে তোমার দিয়েছ ঢেকে
মৃত্যুর কালো বোরখায়

তবুও তো তুমি বেঁচে আছ মা গো, শহীদ মায়ের মৃত্যু নেই
মা গো তুমি এখনো তো আছ তোমার সন্তানের স্মৃতিপটে ।

মা গো, ইউক্রেনের মজনুম অলগা মা
আমি তো তোমার আর এক সন্তান
দূরে বহুদূরে খোরাশানে
হিন্দুকুশ, খাইবার, সিন্ধু, বিপাশা, শতদ্রু
তারপর বঙ্গোপসাগরের পারে
জন্মেছি সে তো তোমারই পেটে মা গো
সারা ছনিয়ার নির্যাতিত মায়েরা এক
অলগা মা আমার, প্রাণ দিয়েছ খুনীদের হাতে
আর দেখ আমি কারাগারে
মা গো তুমি কেঁদো না, দেখ দেখ
আমি স্থির অটল, আমার হাতের মুঠোতে গুঁজে দেওয়া
নিষিদ্ধ জগতের এই লাল ইস্তেহার
মা গো আর তো সহ্য না পাণে তোমার নির্যাতন
নাচালের কৃষক রমণী মা
লীগ নাৎসী অত্যাচারিতা ইলামাতা
তোমার জ্বানবন্দী এসেছে হাতে
নাৎসী কাঠগড়ায় জিমিট্রুডের জ্বানবন্দীর মতো;
বারুদ ঠাসা
খোদার আরস কাঁপানো কী ভীষণ তোমার জ্বানবন্দী মা গো !
মা গো, তুমি সেই অলগা মাতা
ইলামাতা পূর্ববাংলার
বৃটিশ রাজার বানানো ফাঁড়িতে
লীগ সরকারের নাৎসী সান্ধীরী
তোমাকে আনলো ধরে আর এক শীতের দিনে
নতুন ভেনে'র বড় দারোগা পশু,

আবার জিজ্ঞাসা শুরু
নুরুল লিয়াকত খড়গ বোলে
জমিভূখ কৃষকের কাঁধে। তাই
জমি দখলের লাগি যারা লড়ে
তারা কোথায়? তারা কোথায়?
ইলামাত বলবে না তা
দারোগা তোমায় যতই ভয় দেখাক বলাৎকারের
সে তো তোমার একার লজ্জা নয়কো মা
পশুরা তোমাকে মেরে মেরে ভীষণ বাঁ ডালার পর
হাত পা ভাঙলো সে কারা
তোমার সম্মানেরা তাদের রাখবে চিনে ইলামাতা...

... ..

ইকড়ি-মিকড়ি

আলাউদ্দিন আল-আজাদ

ইকড়ি-মিকড়ি চাম চিকড়ি

চাম কাটে মজুতদার

আমি কলির নিমকহারাম কবি

কোন মুখে গান গাইবো তার :

চাম কাটে মজুতদার

একদিন ভোরবেলা শুনলাম পষ্ট

হেঁকে হেঁকে বলছে কে দিন শেষ কষ্টের

কেননা দিয়েছে দেখা উজিরের চক্ষে

প্রজাদের ছুঃখেতে পানি এক বিন্দু :

উজির সাহেব সদয় হলেন

খুলে দিলেন মালগুদাম

পাগল ভুখা নেংটি ইঁহুর

লোকমুখে তাহার নাম ॥

ইকড়ি-মিকড়ি চাম চিকড়ি

চাম কাটে মজুতদার

আমি কলির নিমকহারাম কবি

কোন মুখে গান গাইবো তার

চাম কাটে মজুতদার ।

এ কি জাছ দেখলাম হায় এ কি ভেলকি

দু'দিনেই গুদামের বুকগুলা হালকা

রাস্তার আশে-পাশে নামে কালো রাত্রি
বস্তার সেই ফাঁকে কোথা করে যাত্রা।

মোদের হাতের চটের থলি
খালি থাকতেই পায় আরাম :
আরাম দিলেন উজির সাহেব
বেঁচে থাকুক তাঁহার নাম ॥

আজকের কবিতা

মযহারুল ইসলাম

ফাঙনে কাল গুণে চলবার লগ্ন
ছাই হল লেলিহান আগুনের স্পর্শে
স্বপ্নের সিঁড়িগুলো একে একে ভগ্ন
নিজীব চোখে দেখি লাল ফুল সযেঁ।

জীবনের আলোছায়া লুপ্তিত অত
আজ সব অনুভূতি যেন মূল-হিন্ন
হৃদয়ের যত সব দাবী অনবদ্য
অবসিত চেতনার বিবরেই ক্রিন্ন।

যেন এক আশানের স্তূপ মাথা প্রান্তে
দেহ মুখ খুবড়েই পড়ে আছি আমরা
হুঃসহ মৃত্যুর বেদনা একান্তে
নিবুঁয়ঢ় দলে যায় হৃদয়ের চামড়া।

আজ নয় স্বপ্নের পুষ্পের সম্ভার
বেঁচে থাকবার চাই নূনতম শর্ত
নিমূল মুছে দিয়ে গ্রানি অনুকম্পার
আজ চাই জীবনের স্বচ্ছ আবত'

প্রকারভেদ

শামসুর রাহমান

সুকণ্ঠ কোকিল তুমি বসন্তের মাতাল নকীব,
মধ্যরাতে বিপর্যস্ত ক'রে ফেলো এখানে আমাকে
নিদ্রার গহন থেকে নিয়ে যাও পাতার টেরেসে।
হাঁস তুমি ব্রজেন দাশের মতো কাটিছো সপ্তাহ
পাড়ার পুকুরে যথারীতি। নিঃসঙ্গ কুকুর তুমি
শহরের নানা দৃশ্যে রাখছো হুঁচোখ; টকটিকি
যখন-তখন তুমি ডেকে ওঠো, দেয়ালের মাঠে
দিব্য ফুলবাবু সেজে হাওয়া খাও প্রত্যহ দু'বেলা।

কোকিল, কুকুর, হাঁস, টকটিকি ইত্যাদি ইত্যাদি
আটক করে না জেলে তোমাদের কেউ কিম্বা
গোয়েন্দা নেয় না পিছু, তোমাদের অলিতে গলিতে
কারফ্যু হয় না জারী অতর্কিতে। তোমাদের কেউ
করে না শোষণ কোনো দিন; কেননা তোমরা নও
ঈর্ষণীয় সেই জাতি বস্তুত মানব যার নাম।

এ লাশ আমরা রাখবো কোথায় ?

শামসুর রাহমান

এ লাশ আমরা রাখবো কোথায় ?

তেমন যোগ্য সমাধি কই ?

মৃত্তিকা বলো, পর্বত বলো

অথবা সুনীল সাগর-জল—

সবকিছু ছেঁদো, তুচ্ছ শুধুই।

তাই তো রাখি না এ লাশ আজ

মাটিতে পাহাড়ে কিম্বা সাগরে,

হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই ॥

রাজ কাহিনী
শামসুর রাহমান

ধন্য রাজা ধন্য,
দেশ জোড়া তার সৈন্য !
পথে-ঘাটে ভেড়ার পাল !
চাষীর গরু, মাঝির হাল,
ঘটি-বাটি, গামছা, হাঁড়ি,
সাত-মহলা আছে বাড়ি,
আছে হাতি, আছে ঘোড়া।
কেবল পোড়া মুখে পোরার
ছ'মুঠো নেই অন্ন,
ধন্য রাজা ধন্য !

ঢাম কুড় কুড় বাজনা বাজে।
পথে-ঘাটে সাল্তী সাজে।
শোন সবাই হুকুমনামা,
ধরতে হবে রাজার ধামা।
বাঁ দিকে ভাই চলতে মানা,
সাজতে হবে বোবা-কানা।
মস্ত রাজা হেলে ছলে
যখন তখন চড়ান শূলে
মুখটি খোলার জন্য।
ধন্য রাজা! ধন্য।

ছেলেটা পাগল নাকি ?

শামসুর রাহমান

ছেলেটা কখন ফেরে কতো রাতে কেউ তা জানে না।
রুক্ষ চুল, মাটিমাখা জুতো পায়ে চেনা
গলিটা পেরিয়ে আসে, ঢোকে ঘরে একা, নড়বড়ে
চৌকি দেয় কোল আর পাশের টেবিলে থাকে প'ড়ে
কড়কড়ে ভাত, ভাজা মাছ (মা জানেন ছেলে তার
খুব শখ ক'রে খায়) এবং পালং শাক, ডাল, পুদিনার
চাটনি কিঞ্চিৎ। অথচ সে পোরে না কিছুই মুখে; হ্যারিকেন
শিয়রের কাছে টেনে বই পড়ে, আর ভাবে কী-কী অহিফেন
জনসাধারণ আজ করছে সেবন বিভ্রান্তির চৌমাথায়।
ছাথে সে কালের গতি মার্কস আর লেনিনের প্রসিদ্ধ পাতায়।

সকাল হ'লেই ফের ব্যাকুল বেরিয়ে পড়ে, মা থাকেন চেয়ে—
দেখেন ছেলের মাথা ঠেকে ঘরের চৌকাঠে, তাঁর চোখ চেয়ে—
চকিতে স্বপ্নের হাঁস আসে নেমে, পাখসাটে কতো
ছবি বারে সেকালে, বারে জ্যোৎস্না ফুলিঙ্গের মতো।
ভাবেন এমন একরোখা, কিছুটা বাতিকগ্রস্ত ছিলেন তিনিও, মানে
যার পরিচয় এই দেহ-দীপ, হৃৎকের উপসাগর জানে।

‘ছেলেটা পাগল নাকি ?’—প্রতিবেশী বুড়ো বললেন খনখনে
কণ্ঠে তাঁর। ‘পাগল নিশ্চয়, নইলে ঘরের নিজ'নে
কেন দেয়নি সে ধরা,’ ভাবেন লাঠিতে ভর দিয়ে বুড়ো,
নইলে কেউ বুঝি

মিটিং-মিছিলে যায় যখন-তখন ? সব পুঁজি
খোঁওয়ায়, ঘরের খেয়ে ভাড়ায় বনের মোষ ? জীবনের সকাল বেলায়
গোলাপের মতো প্রাণ জনপথে হারায় হেলায় ?

পুলিশ রিপোর্ট

সামসুর রাহমান

এত উজ্জলতা আমি কখনো দেখি নি।

সবখানে জ্বলজ্বলে ঝোপ; এত উজ্জলতা, চোখ-অন্ধ-করা,

চৈতন্য-ধাঁধানো

উজ্জলতা দেখেন নি মুসাও কখনো।

হাতে নিয়ে পাকা লাঠি দেখলাম ওরা, সংখ্যাহীন

জ্বলজ্বলে ঝোপঝাড় এগোয় কেবলি। চতুর্দিকে তরঙ্গিত মাথা

উত্তাল, উদ্দাম।

সড়কের হুঁকুল-ছাপানো

লোক, শুধু লোক।

লোক,

আমাদের চোখের পাতায়

লোক।

লোক,

পাঁজরের প্রতিটি সিঁড়িতে

লোক

লোক,

ধুকপুকে বকের স্কোয়ারে

লোক।

হঠাৎ সে কোন্ তরুণের বকের গভীর থেকে

কী ঘেন ফিন কি দিয়ে ছোট্টে, পড়ে আমার হুঁহাতে।

রক্ত এত লাল আর এমন গরম
কখনো জানিনি আগে। ব্যারাকে পৌছেই ঘন ঘন
ছুই হাত ঘ'ষে ঘ'ষে

অথচ মোছে না দাগ কিছুতেই সে তাজা রক্তের।
সেই পাইপের অজস্রতা পারে না মুছতে দাগ,
এ-দাগ ফেলবে মুছে এত পানি ধরে না সমুদ্রে কোনদিন।
ঘড়িতে গভীর রাত, ব্যারাক নিশ্চুপ। বারান্দায়
করি পায়চারি আর হঠাৎ কখনো কানে ভেসে আসে

সমুদ্রের বিপুল গর্জন ;
সুন্দরবনের সব বাঘ যেন আমার ওপর
পড়বে ঝাঁপিয়ে ক্ষমাহীন।

ঘুমোতে পারি না আমি কিছুতেই, ঘুমকে করেছি গুম খুন।
কেমন উৎকট গন্ধ লেগে রয় সকল সময়
আমার ছ'হাতে আর সমস্ত শহরে।
সারাদি শহর যদি কেউ দিত ঢেকে
অজস্র সুগন্ধি ফুলে, তবে ছ'টি হাত গোপনে লুকিয়ে
রাখতাম সুরভিত ফুলের কবরে সব দাঁই।

হরতাল

(শহীদ কাদরীকে)

শামসুর রাহমান

প্রতিটি দেরাজ কাউন্টার কুতুহি বিহীন আজ । পা মাড়ানো,
লাইনে দাঁড়ানো নেই, ঠেলাঠেলিহীন ;

মুদ্রার রূপালি পরী নয় নৃত্যপরা শিকের আড়ালে

অথবা নোটের তাড়া গাংচিলের চাকুলে অধীর

হেঁয় না দেরাজ । পথঘাটে

তাল তাল মাংসের উষ্ণতা

সমাধিস্থ কপূরে বেবাক ।

মায়ের স্তনের নীচে ঘুমন্ত শিশুর মতো এ শহর অথবা রংদার

ভাবুকের মতো ;

দশটি বাঙাময় পঙ্ক্তি রচনার পর একাদশ পঙ্ক্তি নির্মাণের আগে

কবির মানসে জমে যে-সুদৃঢ়তা, অন্ধ, ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ৰ

থাবা থেকে গা বাঁচিয়ে বৃকে

আয়াতের নক্ষত্র জ্বালিয়ে

পাথুরে বণ্টকায়ুত পথ বেয়ে উর্গাজাল-ছাওয়া

লুকানো গুহার দিকে যাত্রাকালে মোহাম্মদ যে-সুদৃঢ়তা আস্ত্রনের

ভাঁজে

একদা নিয়েছিলেন ভ'রে

সে সুদৃঢ়তা বুঝি

নেমেছে এখানে ।

রাজপথ নিদাঘের বেশালয়, সুদৃঢ়তা সড়িন হয়ে বৃকে

গেঁথে যায় ; একটি কি দুটি

লোক ইতস্ততঃ

প্রফুল্ল বাতাসে ওরা কাগজের মতো ভাসমান ।
 সবখানে গ্যাসোলিন পাইপ বিস্তৃত, মানে ভীষণ অলস,
 হঠাৎ চমক লাগে মধ্যপথে নিজেরই নিশ্বাস শুনে আর
 কোথাও অদূরে
 ফুল পাঁপড়ি মেলে, পরিষ্কৃত শব্দ শুনি ;
 এঞ্জিনের গহন আড়াল থেকে বহুদিন পর
 বহুদিন পর
 অজস্র পাখির ডাক ছাড়া পেলো যেন ।
 এত পাখি এত
 সুকণ্ঠ নিবিড় পাখি আজো
 এ শহরে আছে কখনো জানি নি আগে ।
 ট্যারিস্ট ছ'চোখ
 বেড়ায় সবুজে :
 সমাহিত মাঠে
 ছেলেদের ছায়ারা খেলছে এক গভীর ছায়ায় ।
 কল কারখানায়
 তেজি ঘোড়াগুলো
 পাথুরে ভীষণ ;
 আশনাল ব্যাকের জানালা থেকে সরু
 পাইপের মতো গলা বাড়িয়ে সারস এক স্তম্ভতাকে খায় ।
 শহর ঢাকার পথ ফাঁকা পেয়ে কতো কী-যে বললাম হেঁটে যেতে
 বানালাম ইচ্ছে মতো : আঙ্গুলের ডগায় হঠাৎ
 একটি সোনালি মাছ উঠলো লাফিয়ে,
 বড় হ'তে হ'তে
 গেল উড়ে দূরে
 কোমল উচ্চানে
 ভিন্ন অবয়ব

খুঁজে নিতে অজস্র ফুলের বৃন্দোদ্যানে।
হেঁটে যেতে যেতে
বিজ্ঞাপন এবং সাইনবোর্ডগুলো মুছে ফেলে
সেখানে আমার প্রিয় কবিতাবলীর
উজ্জ্বল লাইন বসালাম
প্রতিটি পথের মোড়ে পিকাসো গাতিস আর ক্যাণ্ডিনস্কি দিলাম
ঝুলিয়ে।

চৌরাস্তার চওড়া কপাল,
এভেন্যুর গলি, ঘোলাটে গলির ক'টি,
হরবোলা বাজারের গলা
পাষণপূরীর রাজকন্যাটির মতো
নিরুপম সৌন্দর্যে নিখর।
স্তূপীকৃত জঞ্জালে নিক্রিয় রোদ এবং বিড়ালছানা মূহু
থাবা দিয়ে কাড়ে
রোদের আদর।

জীবিকা বেবাক ভুলে কাঁচা গ্রহরেই
ঘুমায় গাছতলায় ঠেলাগাড়ির ছায়ায় কিংবা উদাস আড়তে,
ট্রলির ওপরে
নিস্তরঙ্গ বাসের গরুরে,
নৈশকন্দের মন্থণ জাজিমে।
বস্তুতঃ এখন

কেমন সবুজ হয়ে ডুবে আছে ক্রিয়াপদগুলো।
গভীর তলের নীচে কাছিমের মতো শৈবালের সাজঘরে।
চকিতে বদলে গেছে আজ,
আপাদমস্তক
ভীষণ বদলে গেছে শহর আগার।

কবিতা ৫৭৭

(একটি অংশ)

সৈয়দ শামসুল হক

.....এবং মাত্র গতকাল জনতার আকাশ থেকে খসে পড়া
কয়েকটি তারা আমি দেখলাম বিপ্লবের শহরে। কিংবা আশা নামক
ভাস্করের জ্যোতির্ময় হাতুড়ি ও ছেনিতে আবেগের প্রস্তুতখণ্ডে কয়েকটি
কাজ।

আমি জিগোস করলাম, তোমরা কার আদলে নিমিত ?

তারা বলল, তোমার, তোমার এবং তোমার।

জিগোস করলাম, নাম ?

বলল, আমি।

বাসস্থান ?

চৈতন্যে।

স্থায়ী ঠিকানা ?

ইতিহাস।

উচ্চতা ?

স্বাধীনতার সমান।

বর্ণ ?

জিগোস করো মাটিকে।

বিশেষ চিহ্ন ?

ঐ যুগলের মাঝখানে তৃতীয় একটি চোখ।

আর গন্তব্য ? তোমার গন্তব্য আমাকে বলো।

হৃদয়ে।

আমি তাদের রেখে এলাম এখানে এবং ওখানে।

এখন বিস্মিত হয়ে দেখি, তারা এখানেও নেই কিংবা ওখানেও।

তারা সব'ত্র.....

কারফিউ

আল মাহমুদ

কারফিউ রে কারফিউ
জুয়ার খোলে কে
রাঙা বরণ ছেলেরা লাল
নিশান তুলেছে,
লাল মোরগের পাখার ঝাপট
বাজলো খোয়াড়ে
উটকো মুখো সাহসী বেটা
হাঁটছে জুয়ারে।
খড়খড়িতে চোখ রেখে কে
বেড়াল ডাকে মিউ
খোকন সোনার ভেংচি খেয়ে
পালালো কারফিউ।

অসহ্য সময় কাটে

আল মাহমুদ

অসহ্য সময় কাটে, পায়ে পায়ে উড়ে যায় ধুলো
ক্লান্ত পাখির মতো ক্লিষ্ট হয় আমাদের মন :
জীবিকার নীলছায়া মাখা দুই চোখের কোটর
হয় ভস্মাধার, আর
নির্জন পিপাসার পরিণাম পাক খেয়ে ওঠে
তুপুরের উপশিরা ছিন্ন করে অতিষ্ঠ বাংলার :

আমিও অন্তরঙ্গ হয়ে যাই হঠাৎ তখন
জনতার সমুদ্রের সাথে
বাঘের হাতের মত সন্থ শপথ
সোহাগের গাঢ় ইচ্ছা নিয়ে
নেমে আসে মনের ওপর !

নিম'ম আদর পেয়ে আমিও রক্তাক্ত হবো
বরকতের শরীরের মত ?

গৌরি সেন

আবুল হোসেন

চাল নেই ঘরে গম নেই ক্ষেতে পশ্চিমে পূবে কোনখানেই।

ঘুম ভেঙে শুনি টাকাও নেই।

রাতারাতি সব তবিল খালি,

তুলো আর পাট চামড়া বেচবো সে গুড়ে বালি।

বন্ধ বাজার চাহিদা নাই।

একদা ছিলো যে ছ'চার পাই

গেছে তা কিনতে মাঝান মাখন দিয়াশলাই।

যে যেখানে পারে ভাগাভাগি করে পণ্যার পার।

এদিকে হাজার হাতির খোরাক চাই রাজার

উজির যাবেন নাথিয়া গলি

লে আও হাওয়াই জাহাজ, লে আও টাকার খলি ;

সফর ক'রতে লাট আসেন

ভক্তরা সব কামান দাগেন ডিনার দেন।

টাকা দেবে তো সে গৌরি সেন।

দেবো, সব দেবো

আবুল হোসেন

দেবো, সব দেবো যা যা চাও—

কলমীলতা বুয়ে পড়া মাচা

দাওয়ার শালিকগুদা খাঁচা

টীকের ছাইতে ভরা কলকে ছুটো

গোয়ালে ছড়ানো ভাঙ্গা ঘুঁটো

বাতায় শিকের তোলা ফুটো

পেতলের কলসীটা

মাছুল বালিশ তেলচিটা

এখনো বা আছে।

ধান তো আর নেই পাটও শেষ

বছর বছর ডোবে দেশ

আম জাম কাঁঠালের

জমি গেছে ঢের

ফল নেই গাছে।

নাও, যা যা পারো নিতে

চৌদ্দ পুরুষের ভিটে

গোয়ালের গরু

ঘরের মা-বোন জরু

ছেলের মেয়ের শব।

সাহেব, দিয়েছি দেবো সব।

মরবে কি মানুষটা ?

মনে ঢাকা ফাল্গুনটা ?

ঝাঁঝরা বৃকের মধ্যে শুধু
জ্বলবে আগুন ধুধু
থাকবে ছ' চোখ ভ'রে ঘৃণা ।
সে তো আর নিতে পারবে না।

বাজার দর
আবুল হোসেন

বাড়ছেদাম
অবিরাম
চালের ডালের তেলের নুনের
হাঁড়ির বাড়ির গাড়ির চুনের।
আলু মাঙ্গা বালু মাঙ্গা,
কাপড় কিনিতে লাগে দাঙ্গা,
উঠছে বাজারে হু হু করে সব কিছু—
আঁকের শাকের কাঠের পাটের আম লিচুর।
খাওয়ার জিনিস শোয়ার জিনিস
পরার জিনিস মরার জিনিস
কিছু ছোঁয়ার সাধ্য নাই।
ঘাটতি কেবল যেদিক চাই

অভাব শুধু নাই মানুষের।
চাই কত মণ, চাই কত সের,
আগা চাও বাচ্চা চাও
জোয়ান বুড়ো আসল ফাও
চাহিদা নাই মানুষগুলার।
কেবলি তার পড়ছে বাজার।

হৈমন্তী ত্রতকথা
আবুযকর ছিদ্দিক

রাত্রি ধাত্রী
শিশিরের শুভলক্ষ্মী চরণ রাখে চুপে
সিঁথির সিঁছর মোছে পাছে।
আপক ধাত্তার নত্ন ঐশ্বর্য
বাংলার প্রান্তর দিগন্ত প্রান্ত জুড়ে।
পোয়াতী হৈমন্তী মাতা
সুধার সক্ষরা।

কাল পাঁচা
গেরস্থের উঠোনে আডাক ডাকে
ভয়ঙ্কর কৃষ্ণপক্ষ শনিবার রাতে
ডানা নাড়ে কঁকায় ডরায়,
গুপ্তচর ইঁদুর স্ফুট খেঁড়ে
মড়াইয়ের তলপেটে সোজা।
সকালের ক্ষেচ অতি সংক্ষিপ্ত—
বাচ্চার গলায় ঝোলে
হাঁপানির তাবিজ।

দায় ভয় পেয়ে বসে আমাদের
আমরা যারা মাটির যন্ত্রণা নিয়ে লিখি
লেখার ফসল বেচে
দারাপুত্র কলত্র পোষণ করি,
যা কিছু ছাপাই সবি অকাল ভাষণ।

প্রেতযোনি কালো ছায়া
প্রতিবার হেঁটে যায় জাগার আগই,
চোখ শুধু জ্বলে যায়
কার্তিকের অবারণ রোদে।

নুনফ্যান যেচে ফেরে যারা
যেহেতু ভোটের তারা
তাই বেঁচে থাকে।

দিবাস্বপ্নে কুহকী সাস্থনা আঁকে
নল্পী কাঁথার মাঠ।
আর তাই

আয়নুল জয়নুলরা
ছড়াকাটা তালে তালে
বীজ বুনে আসে।

অথচ মাটির দুধ
এমন কি ধাত্রীমাথা রাত্রির নজর
জাতকের ঠেঁগে হতে শুষে নেয়
দুধের স্রবাস।

খিড়কি দাওয়া পার হয়ে
ফাঁকা চিটে উঠে আসে
শৈবিরগী চরণ ফেলে ফেলে।

ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ির গলা।

বাংলার গান
ছিটেফেঁটা রক্তরাঙা
হাটে বাটে ঘাটের চাতালে
স্রব পায়।

আরে। কিছু রটায় রব
আমাদেরি দলিত পাণ্ডুর
পাণ্ডুলিপি
ক্রমাগত সূহৃতর উত্তরের তরে,
যেহেতু বাংলাদেশ
ধাঘাই দৈনিক অন্ন অভাবধি।

শপথের স্বর
আবুবকর সিদ্দিক

আবার আমি ফিরে আসবো
তোমার অনন্ত সান্নিধ্যে
এই কালো খোঁদল
কড়া-পড়া হোঁচটগুলো গোণা শেষ হবে
যাসের মাথায় আমার জন্মে পেতে রাখ
শিশিরের অভিনন্দন বিন্দুগুলো
ভাল বাসায় ছুঁয় ছুঁয়ে
আবার আসবো আমি
তোমার অনন্ত সান্নিধ্যে ।
কহ্লারের পত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে
প্রমত্ত হাওয়ার ঝর্ণা
আমাদের স্বরষত্রে গান তুলে যাবে
রোদ্দুর পিছলে যাবে—
শালিখ ফড়িং চিল কলাপাতায় ।
তোমার গালে এসে টোল খাবে—
নরম গোধূলি ।

তার পর
সমস্ত রাত
আমরা দুইজনাই জ্বলব
তাপ বিকিরণের তাতে
সমস্ত বিচ্ছেদ ও বেদনার উপাস্তে
আমি আসবো।

হেঁটে হেঁটে রক্তাক্ত পায়ে
ছোবল ও তরঙ্গগুলো মাড়িয়ে
তোমার অনন্ত সান্নিধ্যে
আর—

ডান হাতের মুঠোয় আগুন উপড়ে আনবো
আন্ত এক শপথের চারা
তোমার জন্যে।

একান্ত দেবরাজের পাণ্ডুলিপি

আবদুল্লাহ্, আবু সায়ীদ

আমি কবি হতে চাই—

প্রত্যেকটি অনুচ্চারিত পিপাসার।

আমি কবি হতে চাই দারিদ্র্যের

এবং বিস্তের।

বিস্তের মুখের বদর্যতার,

দরিদ্রের দুঃখের শক্তির।

আমি কবি হতে চাই বিপ্লবের

এবং শান্তির, ধর্মের এবং

নাস্তিকতার।

একটা মেয়ের নরম গালে যে অলৌকিক আপেল ফুটেছে

আমি কবি হতে চাই তার।

যে প্রান্তরচারিণী তাতারিণী ঘোড়ার খুরের শব্দে

নিজস্ব লোকালয় ভুলে চেনা পথ হারিয়ে ফেলেছে অপরিচিত

জনপদে

আমি তার কবি হতে চাই।

আমি কবি হতে চাই সে'নালী শব্দাবলীর অফিয়ুস

রূপের কুৎসিত শোকে ডুকরে উঠছে প্রেমিক বাঁশীতে যে বেদনা

পতনোন্মুখ সভ্যতার হেলে পড়া টাওয়ারের প্রতিটি

মর্বেল অঙ্ক কাদায়—আমি তার

আমি কবি হতে চাই আশ্চর্য দেবতার

এবং লোভী জানোয়ারের, গায়কের ও

কোদানের, সঞ্জম হাতের এবং

মিলিত কণ্ঠের।

স্বাধীনতা জলছে

দিলওয়ার

ঐ দ্যাখো স্বাধীনতা জলছে,

স্বাধীনতা : চৈতালী সূর্য,

বিরুদ্ধে আক্রোশে বলছে :

জনগণ ! কই রণতূর্য ?

তুলে নাও তূর্যটা হস্তে,

আজো আমি জালিমের বন্দী,

চোরা মার—উঠতে ও বসতে,

আমাকে জড়িয়ে কতো কন্দি !

স্বাধীনতা শ্রমিকের, জনতার

বারা এই ছুনিয়ার ভিত্তি,

স্বাধীনতা মানুষের সমতা—

সে-যার স্বপ্নে দোলে পৃথ্বী ।

জনগণ ! তোল রণতূর্য,

আর নয় মোখির উক্তি

আমি যে তোদেরি প্রাণ-সূর্য,

শেষবার চাই আজ মুক্তি ।

লজ্জা

নির্মলেন্দু গুণ

আমি জানি সে প্রতিকৃতি কোনদিন কটোতে দেখে নি
আয়নায় অথবা সন্ধ্যাপে বসে যে রকম তার জলে সর্বনাশা সমুদ্র
দেখা যায় তার জলে

মুখ দেখে হঠাৎ লজ্জায় সে শুধুই ঘ্রান হতো একদিন
আমি জানি পিঠ থেকে স্নাতোর কাপড়
কোনোদিন খোলে নি সে পুকুরের জলে, লজ্জা
সমস্ত কিছুতে লজ্জা, কণ্ঠে, চুলের খোঁপায়, চোখের পাতায়
আমি জানি আসন্ন প্রসব অপরাধে, অপরাধবোধে
ফীতোদর সেই নারী কি রকম লজ্জাশীলা ছিল।

অথচ কেমন আজ ভিনদেশী মানুষের চোখের স্তম্ভে
নগ্ন সে নিলজ্জ, নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে আছে
জলাধারে পশু আর পুরুষের পাশে—শুয়ে আছে।
ছড়ানো মাংসল বাহু নগ্ন
কোমল, পায়ের পাতা বুকের উত্থানগুলো নগ্ন
গ্রীবার লাজুক ভাঁজ নগ্ন—কে যে উন্মাদ হয়ে
তার সে নিঃশব্দ নগ্নতায় বসে আছে।

তার সমস্ত শরীর জুড়ে প্রকৃতির নগ্ন পরিহাস, শুধু
গোপন অঙ্গের লজ্জা ঢেকে আছে

সদ্যপ্রসূত মৃত সন্তানের লাশ।

তার প্রতিবাদহীন স্বাধীন নগ্নতা বন্দী করে এখন
সাংবাদিক, কুলস্ত ক্যামেরা নিয়ে ফটোগ্রাফার
ফিরে যাচ্ছে পত্রিকার বিভিন্ন পাতায়। অসহায়,
সূর্যের কাফনে মোড়ানো আমার বোনের মতো এই লাশ।’
আগের মতন আর বলছে না, বলবে না।’

‘আমি কিছুতেই ছবি তুলব না।’

যেন তার সমস্ত লজ্জার ভার এখন আমার। কেবল আমার।*

*নির্মলেন্দু গুণ এ-কবিতাটি লিখেছিলেন ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের
ফলে নিহত বাঙালী মা-বোনদের কথা স্মরণ করে।

শতাব্দী সাক্ষী

আবদুর রশিদ খান

অলীক স্বপ্নের মত বাস্তব সীমানা
ভেঙ্গে ভেঙ্গে শতাব্দীর শেষাধে
আমার এই শাস্ত জগত্ভূমির মাটিতে
কোন পাষণ্ড হৃদয়ের নিষ্ঠুর আঘাতে
আমার বৃকে ব্যথার পাহাড় চাপিয়ে—
স্তব্ধ করতে চায় আমার হাসি আর গান
যে পুণ্যভূমির পর্ণ কুটিরে অনাবিল শান্তি
যেখানে ঘুমাতাম শাস্ত শিশুর মত
শান্ত মায়ের কোলে
ওরে আয় নতুন সূর্যের দিন
প্রচণ্ড উত্তাপে আমার বৃকের ব্যথার
পাহাড় গলিয়ে রক্তের ঝর্ণা বইয়ে,
বেদনা ঝরা স্রবের মূচ্ছনা তুলে, নীরবতার
ছন্দ পতন ঘটিয়ে

শতাব্দী সাক্ষী

আমি জানি তুমি পারবে তুলতে
সমুদ্রের বিপুল ঢেউ। আর সেই ঢেউ
আছড়ে আছড়ে মিশে যাক আমার
বেদনার পাহাড়ে লুড়ি হ'য়ে
ভেসে যাক রক্তের ঝর্ণায়।

তারপর

তোমার রক্ত, আমার মজ্জা, শহীদের
আত্মা এ বাংলার অমর গান গাইবে।

বারবারা বিডলার কে

আসাদ চৌধুরী

বারবারা

ভিয়েনামের উপর তোমার অমুভূতির তরঙ্গমা আমি পড়েছি—

তোমার হৃদয়ের স্রবাতাস

আমার গিলে-করা পাঞ্জাবীকে মিছিলে নামিয়েছিল

প্রাচ্যের নির্ধাতিত মানুষগুলোর জন্তে অনীম দরদ ছিল সে

লেখায়,

আমি তোমার ঐ একটি লেখাই পড়েছি

আশীর্বাদ করেছিলাম, তোমার সোনার দোয়াত কলম হোক।

আমার বড় জানতে ইচ্ছে করে বারবারা, তুমি এখন কেমন

আছ ?

নিশ্চয়ই তুমি ডেট করতে শিখে গেছ।

গাউনের রঙ, আর ছাট নিয়ে চায়ের টেবিলে মা'র সঙ্গে ঝগড়া

হয় ?

অনভ্যস্ত ব্রেসিয়ারের নীচে তোমার হৃদয়কে কি চির দিন ঢেকে

দিলে ?

আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে বারবারা।

তোমাদের কাগজে নিশ্চয়ই ইয়াহিয়া খাঁর ছবি ছাপা হয়—

বিবেকের বোতামগুলো খুলে হৃদয় দিয়ে ঢাখো

ওটা একটা জল্লাদের ছবি

পনেরো লক্ষ নিরস্ত্র লোককে ঠাণ্ডা মাথায় সে হত্যা করেছে

মানুষের কষ্টার্জিত সভ্যতাকে সে গলা টিপে হত্যা করেছে

অদ্বুত ষাট্‌করকে দেখ

বিংশ শতাব্দীকে সে কৌশলে টেনে হিটড়ে মধ্যযুগে নিয়ে যায়।

দেশলাইর বাজর মত সহজে ভাঙে
গ্রন্থাগার, উপাসনালয়, ছাত্রাবাস,
'মানুষের সাধ্যমত ঘরবাড়ি'
সাত কোটি মানুষের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের ফুলকে সে বুট জুতোয়
ধেঁতলে দেয়।

২

টু উইমেন ছবিটা দেখেছ বারবারা ?
গীর্জায় ধর্মিতা সোফিয়া লোরেনকে দেখে নিশ্চয়ই কেঁদেছিলে
আমি কাঁদি নি, বুকটা শুধু খাঁ খাঁ করেছিল—
সোফিয়া লোরেনকে পাঠিয়ে দিয়ে—বাঙলাদেশে
ত্রিশ হাজার রমণীর নির্মম অভিজ্ঞতা শুনে
তিনি শিউরে উঠতেন।

অভিধান থেকে নয়
আশি লক্ষ শরণার্থীর কাছে জেনে নাও, নির্বাসনের অর্থ কি ?
জর্জ ওয়াশিংটনের ছবিঅলা ডাক টিকেটে খোঁজ থাকবে না
স্বাধীনতার,

আমাদের মুক্তি-যোদ্ধার কাছে এসো —
সাধু গ্র্যাবের মর্মর মূর্তিকে গণতন্ত্র আর মানবতার জন্তে
মালীর ঘামে ভেজা ফুলের তোড়া দিয়ে না —
নিহত লোকটি লজ্জায় ঘুণায় আবার আত্মহত্যা করবে।

বারবারা, এসো,
রবিশঙ্করের সুরে সুরে মুমূষু মানবতাকে গাই—
বিবেকের জং ধরা দরোজায় প্রবল করাঘাত করি—

অস্ত্রায়ের বিপুল হিমালয় দেখে এসো জুঁক হই, সংগঠিত হই
জল্লাদের শাণিত অস্ত্র
সভ্যতার নির্মল পুষ্পকে আহত করার পূর্বে,
সঙ্গীত ও চিত্রকলাকে ধ্বংস করার পূর্বে
দর্শন ও সাহিত্যকে হত্যা করার পূর্বে
ছাড়পত্রহীন সূর্যকিরণকে বিষাক্ত করার পূর্বে,
এসো বারবারা, বজ্র হয়ে বিদ্ধ করি তাকে ।*

* কবি আসাদ চৌধুরী এ-কবিতাটি রচনা করেছেন সম্প্রতি অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ
আরম্ভ হওয়ার পূর্বে নয় ।

সাহস

ওমর আলী

ছোট পাখিটি ছড়িয়েছে ডানা ওপরে বাতাসে,
মাঝে মাঝে গাছে অথবা মাটিতে দ্রুত নেমে আসে।
চেয়ে চেয়ে আমি পাখিরে দেখি না, দেখি শুধু তার
ছোট বকেও অসীম সাহস আকাশে ওড়ার।

অবাক হবো না

মাসুদ আহমেদ মাসুদ

যদি শহীদে রক্ত

গুটিয়ে বিকোভ হয়ে যায়

যদি মিছিলের প্রবল পদপাত

মুক্ত স্বদেশের ইঙ্গিত হয়ে যার

যদি ভাজা ঘাসের শিব

চোখের সামনে মলিন হয়ে যায়

যদি তারার দল

মৌমাছির মতো ঝাক বেঁধে বেঁধে উড়ে যায়

আমি অবাক হবো না।

রক্ত দিলাম মাগো

আনসার আলী

কলার পাতায় রক্ত দিলাম মাগো ;
সবুজ শিশুর রক্ত-নিকানো মাটি,
অপরূপ তুই কলঙ্কময়ী হলি
মুণ্ডমালা গলায় দোলে তোর ।

সবুজ বাঙলা লালে লাল আজ একি ?
নীলিমার লাল রক্ত সূর্য ওঠে,
কচি ঘাসপাতা বাঙলায় ত্রিয়মাণ,
পলাতক-আলো সোনার বাঙলা মাগো ।

বারুদ-গন্ধ গোলা গুলি লালে লাল ;
রক্ত-অপথ রাজপথে হরতাল,
ভয়হীন পাখি মুক্ত কণ্ঠ তার
পাখি গান গায় নিজের কণ্ঠে মাগো ।

সে গান রুখবি কি দিয়ে সর্বনাশী !
আছরী ছুলালী কলঙ্কময়ী হলি,
আর কতকাল রক্তের স্বাদ নিবি !
রক্ত তিলক ললাটে লজ্জা বলি ।

রক্তের শোধ রক্তে শুধবো মাগো ;
রক্তের শোধ সশস্ত্র সংগ্রাম,
সহস্র যুবা সূর্য সেনানী আজ
স্মরণে তাদের উদাত্ত বাহু জাগো ।

এ দৃশ্য আজকাল

আহমেদ মনসুর

এ দৃশ্য আজকাল অহরহ
ঘটছে ঘটবে
এ আগুন নির্ভীক, দাউ দাউ
জ্বলছে, জ্বলবে।

মজদুর সব আজ চঞ্চল, ফুরুর
চিৎকার রাস্তার মিছিলে
মাঠ ঘাট জনপদ ক্রুর
কাঁপিছে কিশোরের আওয়াজে।

এ দৃশ্য আজকাল অহরহ
ঘটছে ঘটবে ;
নয় নয় এ জীবন নিশ্চল নিশ্চূণ
কান্না ও পিছুটান মিথ্যে।
এজীবন চায় আজ সংগ্রাম
দাসত্ব শৃঙ্খল ছিঁড়তে।

ক্ষুধাতুর দেহে আজ শক্তি
পাঁজরার হাড়ে হাড়ে ইম্পাত
চোখে আজ বজ্রের দৃষ্টি
হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে ভাঙছে
যতো সব পুরাতন জঞ্জাল,
চকচকে ধারালো কাস্তুর
ঘায়ে ঘায়ে প্রাচীনতা ধ্বংসছে।

এদৃশ্য আজকাল অহরহ

ঘটছে ঘটবে

এ আগুন নির্ভীক দাউ দাউ

জলছে, জলবে, জলবে.....

এ আগুন নির্ভীক

দাউ দাউ জলছে জলবে।

এ জীবন চায় আজ সংগ্রাম

দাসত্ব শৃঙ্খল ছিঁড়তে।

সুবর্ণ গ্রামে যাবো

মাকিদ হারদার

চোখ বুজলে আজো যেন সব দেখতে পাই।

পিঁপড়ের সারির মতো মিছিল।

অনাহার ক্লিষ্ট ভাইয়ের মুখে।

পন্টনে লাল শালুতে ঘেরা স্টেজ।

রাজপথে রক্তের দানা।

মোড়ে-মোড়ে ব্যারিকেড

মাছির মতো পুলিশের

শহরময় আনাগোনা

লজ্জিত দেয়ালের গায়ে

আবেদন নয় নিবেদন নয়,

পোস্টার ছাড়পত্র।

জীবনের ছাড়পত্র।

কান পাতলে আজো যেন সব শুনতে পাই।

পন্টনের গণসঙ্গীতের আসরে।

মতিউরের আর্তনাদ। বায়তুল

মোকররমে মা-বোনদের বিফারিত

শ্লোগান। হাহাকার। কীটিনাশার

অতর্কিতে প্রবেশ। ঘরের বারান্দায়

বাজ পড়া শব্দ।

মেসিনগান, বেয়নেট, বোমা,

অয়ারলেস, হেলমেট, অবোধ্য

ভাষার ধ্বনি, সেদিন পারি নি রপ্ত করতে।

তাই, আজ আর চোখ বুজে নয় ।

আজ আর কান পেতে নয় ।

হরতালে মিছিলে দফার দাবীতে সর্বত্রই আমি
আর আমার সন্তা ।

অনেক পড়লাম সংবাদপত্রের শিরোনামা । ভয়ে মাকে

কাছে ডাকি শহরে-বন্দরে

গ্রামে : আমাদের সূর্যহীন মুলিঘরের পাড়ায় । আমরাও

শুনেছি সেদিন সব বন্ধ

জীবনের লেনদেন, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল

নাস', ডাক্তার, মৃত্যু প্রায়

রুগী : তারও দাবী : বাঁচতে চাই বাঁচতে চাই । দাবী দাবী

আরো দাবী । তারপরে

আবোধ শিশুর মতো হেঁটে এলো একে-একে সকলেই

বাঁচতে চাই : আশুন বাঁচার

মিছিলে । সভা চাকা বন্ধ ঘেরাও অনশন বাদ-প্রতিবাদ

কাঁদানে গ্যাস লাঠিচার্জ

পুলিশের হামলা । অবশেষে পোশাকে সাজালাম

তাদের পল্টনের শিশির-পড়া

সবুজ ঘাসের মাঠে : জানাজা জানাজা 'সুবর্ণগ্রামে যাবো'

শুনে একদিন হায়নার মতো

এলো শহরময় কারফিউ । রাজশাহীতে অধ্যাপক নিহত ।

আহত নিখোঁজ । ভাঙার গান

আমার চোটে : এখনো আছে মস্ত একটা কিরিস্তি ।

সবই নিহতের

সবই আহতের

সবই নিখোঁজের বিরাট ফদ' হাতে

নিয়ে ঘুরঘুর করছি যন্ত্রণাময় অন্ধকারে, তাই, পারি না নিজেকে

বোঝাতে : সে অবোধ শিশুর মতো কাঁদে, সে বড় যন্ত্রণাময়
মালিবাগের রেলগেট
কাওরান বাজারের রেলগেট, তার
নিঃশ্বাসের ধ্বনি, আমি
আজকেও শুনে এসেছি। চারদিকে ঘুরঘুটি অন্ধকারে তারা
এসেছিল : 'সুবর্ণগ্রামে যাবো' বলে
কেউ যেতে দিল না তাদের
কেউ যেতে দিল না, হয়।
তাই পেটে আমার আগুন জ্বলছে, জ্বলছে শান্তির জন্য
সুদূর ভিরেংনামে
আমার কঙ্কালসার বুকে অসহ্য বাধা, আমি তবু শেষবারের
মতো পড়ে যেতে-যেতে বন্ধুদের জলন্ত বাতিটাকে
এই ক্ষীণকায় হাতের মূঠায়
ধরে রাখতে চাই।

SHAHJUL MAZID MUNNA
72/B Malibagh Chowdhurypara
Dhaka-1219, Phone 1 414706

রক্তের আখরে লেখা হলো ইতিহাস

এম. আনিসুজ্জামান

রক্তের আখরে লেখা হলো যেদিন

সংগ্রামের নয়। ইতিহাস—

সেদিন থেকে, হে আমার স্বদেশ,

চারিদিকে দেখি শুধু বিদ্রোহের উদ্দাম উচ্ছ্বাস

যুগ যুগ নিপীড়িত পদানত জনতা

মরণ-পণ কঠিন শপথে বুক বেঁধে

রুখে দাঁড়ালো যেদিন

জালেমশাহীর উত্তত বেয়নেটের সামনে,

সেদিন থেকে দিকে দিকে

দেখলাম শুধু অগুন্তি বিদ্রোহী মানুষ

ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত

খেটে খাওয়া অমর জনতার উদ্ধত উন্নত চেঁটে

এগিয়ে চলেছে ছুঁবার

সমুদ্রতরঙ্গের চেয়েও হৃদম গতিবেগে

ফ্যাসিবাদের মৃত্যু-পরোয়ান। হাতে নিয়ে।

দেখলাম কণ্ঠে তাদের মরণ-জয়ী শপথ

হাতে অগ্নিমশাল

বিপ্লবী বজ্রমুঠিতে বিদ্রোহের পতাকা।

পুলিশ আর ফৌজের সশস্ত্র ব্যারিকেড ভেদ ক'রে

এগিয়ে চললো সে অশান্ত মিছিল—

ছোপ ছোপ রক্তের স্বাক্ষর এঁকে প্রতিটি পথের ফাঁকে।

দেখলাম সে মিছিলের বিপ্লবী নায়ক।

আসাদ-রুস্তম-মনির-মতিয়ার
কচি কচি সোনার ছেলে, সূর্যমুখী ফুল, আমার স্বদেশ মাতৃকার ।
দেখলাম বিশেষ জানুয়ারী আমার নয়নের মণি
আমাদের বৃকের রক্তে লেখা হলো বিপ্লবের নয়। ইতিহাস ।

তারপর চললো শুধু দেয়া-দেয়া নেয়ার পালা
তাই একে একে আরো দেখলাম—
অনেক তাজা তাজা সূর্যমুখী ফুলের বুক চিরে রক্ত বারলো অটেল,
রাজপথ সিক্ত হলো চাপ চাপ লাল খুনে ।

ওরা শহীদ হলো,
ওরা লুটিয়ে পড়লো, ঘুমিয়ে পড়লো, মা জন্মভূমির কোলে ।

তারপর, হে আমার স্বদেশ,
তোমার নরম মাটিতে, তোমার সবুজ ঘাসের বৃকে
কান পেতে আজও আমি শুনতে পাই
আসাদ-রুস্তম-মনির-মতিয়ার-জোহা-জহরুলের
এবং তোমার আরো কত সোনার ছেলের অতৃপ্ত আত্মার
অগ্নিঝরা বিদ্রোহী শপথ ।

আমি তাই, শান্তির অঞ্জন ছ'চোখে মেখে
ধুমোতে পারি নি মোটে ;

আমি কঠিন শপথে বৃক বেঁধে
আবার ঘোষণা করতে বাধ্য হই জীবনের উদ্দাম প্রত্যয় :
“সংগ্রাম সংগ্রাম—চলবে সে ছর্ব্বার ।”

কেননা—
ঘন আধারের যবনিকা এখন হয় নি বিদীর্ণ
ডাকিনী-যোগিনী-নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস

এখনও বিবাইছে বায়ু এ দেশের ;
এবং আমার স্বদেশজননী
আমার কোটি কোটি নিপীড়িত ভাইবোন
জালেমের-জুলুমের রাহুগ্রাস হতে
আজও হয় নি মুক্ত ; হয় নি স্বাধীন—
এবং পৃথিবী এখনও নতুন চন্দ্রে হয় নি মধুর ।

Who will become more benifited by using bidet

